খলীফায়ে বদরপুরী ছাহেব ক্বিবলাহ ছিরামপুরী

[রাহমাতুল্লাহি আলাইহি]

সম্পাদনায়

জুবায়ের আহমদ

সম্পাদনায়ঃ জুবায়ের আহমদ

প্রকাশনায়ঃ বারাকাত রক্বীবিয়াহ ফাউন্ডেশন,
শাহজালাল উপশহর, ব্লক - ই, রোড নং - ১
বাসা নং - ১ / ৪ , দু' তলা - A- 2
মোবাইল নং - ০১৭২০৪০০৪৭৯ , ০১৭১৮৫২৬০৮৩
U. S. A – 646- 610 – 0740, 718 – 770-7297

এ সংস্করণের হাদিয়ালব্ধ টাকা গৌরীপুর শাহজালাল দারুল কোরআন রক্বীবিয়াহ মাদ্রাসার ব্যয় নির্বাহে নিবদ্ধিত।

প্রকাশকালঃ জানুয়ারী, ২০১০ খ্রিষ্টাব্দ

কম্পোজঃ বুশরা কম্পিউটার, ছিরামপুরী ভবন
রাখালগঞ্জ পূর্ববাজার, সিলেট।

হাদিয়াঃ সাদা ৬০ টাকা
নিউজ ৪০ টাকা

প্রাপ্তিস্থানঃ

শাহ মালুম লাইব্রেরী
ফেঞ্চুগঞ্জ বাজার, সিলেট।

ইসলামিয়া লাইব্রেরী
রাখালগঞ্জ বাজার, সিলেট।

নিউ আদর্শ লাইব্রেরী
হাজী কুদরত উল্লাহ মার্কেট, সিলেট।

রহমানিয়া বইঘর
রাজা ম্যানশন, জিন্দাবাজার, সিলেট।

খলীফায়ে বদরপুরী
ছাহেব ক্বিবলাহ ছিরামপুরী
[রাহমাতুল্লাহি আলাইহি]

হযরত ছিরামপুরী (রহ:) এর জীবন
অবলম্বনে
একটি পর্যালোচনা গ্রন্থ

জুবায়ের আহমদ
এম, এম, (হাদীস) ৯ম স্থান,
বি, এ অনার্স ফার্ষ্ট ক্লাস ফার্ষ্ট , এম, এ (ইংলিশ)

পরিবেশনায়
বারাকাত রব্বীবিয়াহ ফাউন্ডেশন
শাহজালাল উপশহর
ব্লক - ই, রোড নং ১
বাসা নং - ১/ ৪, ২য় তলা A - 2
মোবাইল নং -০১৭২০৮০০৮৭৯ , ০১৭১৮৫২৬০৬৩
U. S. A – 646 – 610 - 0740. 718 – 770 - 7297

সূচিপত্র

প্রাককথন

সেই সত্তার নামে শুরু করছি, যিনি আমাকে করেছেন ক্ষম,
আর দুরূদ পড়ছি সেই মহানবীর, প্রেম বিনে যার আমি অক্ষম।

মাটি দিয়ে গড়া মানুষ আল্লাহর এক আজব সৃষ্টি, একটি রহস্য। এর মধ্যে আল্লাহ প্রচ্ছন্ন আমানত সাজিয়ে রেখেছেন। প্রেম, সৌন্দর্য, বিপ্লব ও সুপ্ত রহস্য উদ্ভাবনের রহস্যময় শক্তি সব কিছুরই সমাহার রয়েছে এই অনুপম সৃষ্টিতে। কারণ প্রতিনিধিত্বের মহান দায়িত্বটি যে তারই কাঁধে। আল্লাহ পাক বলেন: انى جاعل في الارض خليفة (নিশ্চয়ই আমি পৃথিবীতে আমার প্রতিনিধি পাঠাচ্ছি)। (moral responsibility of representation) এই বলে মানুষকে আল্লাহ অস্থিত্বে নিয়ে আসলেন। আর তখনই প্রকৃতিতে আসল পরিবর্তন। আল্লামা ইকবাল বলেন-

ইশক্ব বলল উচ্চ রবেঃ আশিক্বের হয়েছে সৃজন
সৌন্দর্য বলল কম্পিত স্বরে পয়দা হয়েছে বুদ্ধিমান
প্রকৃতি করল ভয়ঃ
অক্ষম জাহানের মৃত্তিকা থেকে সৃষ্ট হলো একজন
ভাঙ্গা গড়ার খেলা খেলে ঘটাবে পরিচয় সাধন।
আকাশ থেকে আলমে মালাকুতে আসল সংবাদঃ
সুপ্ত রহস্য উপলব্ধিকারীর হয়েছে সৃজন ঃ সাবধান।

জীবন মানেই সংগ্রাম। প্রতিটি মানুষ সে সংগ্রামের এক একজন সৈনিক। একজন সফল সৈনিক তিনিই, যাঁর মধ্যে রয়েছে সুপ্ত প্রেম, সৌন্দর্য আর নিজেকে চেনার সফল বাস্তবায়ন। সে দিক বিচারে হযরত ছিরামপুরী (রহঃ) শুধুমাত্র একজন সফল সৈনিকই ছিলেন না, বরং একজন সফল সিপাহসালারও ছিলেন। প্রতিনিধিত্বের সুমহান দায়িত্ব পালনে তিনি গড়ে তুলেছিলেন আপন জাহান। সে জাহানের মৌ মৌ ঘ্রাণে এসেছিল জীবন রহস্যের স্ফূরণ, কেঁপে উঠেছিল বিলজিবাবের মসনদ। ইকবাল বলেন:

যদি হও তুমি জীবন্ত, নিজের ভুবন তবে নিজেই কর সৃজন
এখানেই রয়েছে মানব জীবনের রহস্য,
সৃষ্টির মাঝে আছে জীবন।

আল্লাহর অপার নেয়ামত আত্মার শক্তি মানব জীবনকে করে তুলে বিকশিত। মাটির মানুষের মাঝে নিয়ে আসে স্বর্ণমানবের রূপান্তর। দিন যায়, রাত আসে, যুগে আসে পালাবদল, তবু মুছে যায়না স্বর্ণমানবের জীবনের ইতিহাস। সত্যিই, যে মহান ব্যক্তিত্বকে নিয়ে আমার কাঁচা হাতের এই ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর প্রয়াস- তিনি একজন স্বর্ণমানব। এমন মহান জনের মর্যাদা কেমন হতে পারে? আল্লামা ইকবাল বলেন-

খুদী কো কর বুলন্দ ইতনা কেহ হর তাক্বদীরছে পেহলে
খোদা বন্দেছে খুদ পুঁছে বাতা তেরে রিদ্বা কিয়া হায়?
(অর্থাৎ) ব্যক্তি সত্তাকে এমন উন্নত করে নাও তোমার
যে, তাক্বদীর লেখার পূর্বে খোদা তোমায় জিজ্ঞাসেন
তোমার তাক্বদীর কীরূপ হওয়া দরকার?

কোন মানুষ পূর্ণাঙ্গ মানুষ হতে পারবেনা, যদি না সে তার জীবনের স্তরে স্তরে উন্নতি সাধন

করে। পবিত্র ক্বোরআনে কারীমে আল্লাহ বলেন- لتركبن طبقا عن طبق অর্থাৎ তোমরা অবশ্যই ধাপে ধাপে উন্নতি লাভ করে যাবে। নবী কারীম (সাঃ) বলেন, من استوى يوماه فهو مغبون অর্থাৎ "যে ব্যক্তি তার দুইদিন একই অবস্থায় কাটিয়েছে, অথচ কোন উন্নতি করেনি, সে ক্ষতির মধ্যে রয়েছে"।

হযরত ছিরামপুরী ছাহেব ক্বিবলাহ (রহ:) এর জীবন পর্যালোচনা করলে কাঁচের মত স্বচ্ছ হয়ে উঠে যে বিষয়টি তা হলো, জীবনের প্রতিটি স্তরে স্তরে তিনি করেছিলেন উন্নতি সাধন, আর সে পথের পথিক হয়ে গড়েছিলেন তিনি এক বর্ণাঢ্য সোনালী জীবন। তিনি সুমহান এক সুপুরুষ, সৃষ্টির সেবায় যিনি নিজেকে করেছিলেন আত্মোৎসর্গ। বড়ই তৃপ্তি নিয়ে পান করেছিলেন তিনি সৃষ্টি সেবার অমৃত সুধা। মহান বারী তায়ালার প্রিয়পাত্র তো তিনিই। রাসুলে কারীম (সাঃ) বলেন- الخلق عيال الله فأحب الخلق الي الله من احسن الي عياله অর্থাৎ সমগ্র সৃষ্টি আল্লাহর পরিবার। সুতরাং সৃষ্টির ঐ ব্যক্তিই আল্লাহর নিকট অধিক প্রিয়পাত্র, যে ব্যক্তি তার (আল্লাহর) পরিবারের উপকার করে। আল্লামা ইকবাল বলেন-

আল্লাহর হাজার বান্দা ঘুরায় বনে বনে
অনুগত হব আমি তারই, প্রেম করে যে জন মানবজনে।

হযরত ছিরামপুরী ছাহেব ক্বিবলাহ (রহ:) যে মন্ত্রে উজ্জীবিত হয়েছিলেন তা ছিল, لا تخف ولا تحزن واقدم إلى الأمام (ভয় করোনা, দুশ্চিন্তা করোনা এবং সামনের দিকে অগ্রসর হতে থাক)। জীবনের প্রভূত উন্নতি সাধনে এই মন্ত্রের কোন বিকল্প নেই। আল্লাহর প্রিয়পাত্রদের আসেনা কোন দুশ্চিন্তা, আসেনা কোন ভয়। আল্লামা ইক্ববাল বলেন-

চোঁ কালিমে ছোঁয়ে ফেরআউন রোদ
দর কুলব আওয়াজে লা তাখাফ মুহকম শোদ।
(অর্থাৎ) কোন মুসা যখন কোন ফেরআউনের দিকে যায়
তার মন তখন লা তাখাফ এর মর্মে দৃঢ় হয়।

কলমের আঁচড়ে এই মহাজীবনের চিত্রায়ণ অধমের নিকট কঠিন তো বটেই, অকল্পনীয়ও ছিল। এমন পরিস্থিতিতে সাহস যুগিয়েছিলেন আমার শ্রদ্ধেয় ছোট চাচা। শুধু সাহসই নয়, সার্বক্ষণিক সহযোগিতা ও দিক নির্দেশনার মাধ্যমে যুগিয়েছিলেন তিনি আশার আলো। দিক নির্দেশনা দিয়েছিলেন আমার শ্রদ্ধেয় আব্বাজানও। তাঁদের দিক নির্দেশনার সমুজ্জ্বল আলোকে অবশেষে দেখা পেল মহান এই কর্মশিল্পীর জীবন ও কর্মের রূপরেখা। এই গ্রন্থটি নিছক একটি জীবনী নয়, বরং এক মহাজীবনকে কেন্দ্র করে রচিত একটি বিশ্লেষণাত্মক পর্যালোচনা। আরেকটি বিষয় না বললেই নয় যে, এই মহানায়কের জীবন সংক্রান্ত তথ্যাবলী যে সকল ব্যক্তিবর্গের কাছ থেকে পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল, তাঁদের প্রায় সবাই দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেছেন। তাই আমাদের জানা মতে আরও অনেক কথা, অনেক কাহিনী রয়ে গেছে, যেগুলো সংগ্রহ করা সম্ভবপর হয়ে উঠেনি। তদুপরি যতটুকু সম্ভব হয়েছে ততটুকুই সম্মানিত পাঠকের কাছে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। আরেকটি কথা, মানুষ ভুলের উর্ধে নয়। তাই সতর্কতা অবলম্বনের পরেও কিছু কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে যেতে পারে। তাই আমার বিনীত অনুরোধ, কারো কাছে এমন কিছু ধরা পড়লে তা জানতে দিয়ে সংশোধনের সুযোগ দান করবেন। আল্লাহ আমার এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে কবুল করুন। আমিন।

সম্পাদক

উস্তাযুল মুহাদ্দিছীন আল্লামা হাবিবুর রাহমান ছাহেবের বাণীঃ

বিছমিল্লাহি, ওয়াল হামদুলিল্লাহ, ওয়াছ ছালাতু ওয়াছছালামু আলা রাসূলিল্লাহ।

ওলীয়ে কামিল হযরত শাহ্ জালাল ইয়ামেনী (রহ:) এর সুযোগ্য উত্তরসুরী হযরত শাহ কামাল ইয়ামেনী (রহ:) এর বংশধরগণের অন্যতম এক বুযুর্গ হলেন হযরত শাহ মুহাম্মদ আব্দুর রক্বীব ছিরামপুরী ছাহেব (রহ:)। আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'তের আকাঈদের প্রতি অত্যন্ত পাবন্দ ছিলেন ইসলামের এই মহান খাদেম। পবিত্র মক্কা মুয়াযযামার হযরত শায়খুল কুররা (রহ:) এর কাছ থেকে পবিত্র ক্বোরআনে কারীমের তেলাওয়াতের সনদ হাসিল করে বৃহত্তর সিলেটে তিনি শুরু করেছিলেন পবিত্র এই কালামে পাকের প্রশিক্ষণ। এই সুমহান দায়িত্ব আঞ্জামকল্পে তিনি মিশেছিলেন সমাজের সকল স্তরের মানুষের মধ্যে, প্রেরণা যুগিয়েছিলেন, দেখিয়েছিলেন তিনি হেদায়াতের আলো। তিনি সুমহান, মহান এক দিকপাল। আজো মানুষ খ্যাতিমান এই বুযুর্গকে পরম শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে। দোয়া করি, আল্লাহ তাঁর কবরকে যেন জান্নাতুল ফেরদাউসের টুকরো বানিয়ে দেন। তাঁর জীবনের বিভিন্ন দিক সবার জন্য অনুসরণীয় বলে আমি মনে করি। স্নেহের জুবায়ের আহমদ কর্তৃক এই মহান বুযুর্গের জীবনকেন্দ্রীক একটি পর্যালোচনাগ্রন্থ প্রকাশ করায় অত্যন্ত প্রীত হলাম। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনই একমাত্র সর্বোত্তম প্রতিদানদাতা। আমিন।

মোঃ হাবিবুর রহমান
সাবেক অধ্যক্ষ
ইছামতি দারুল হাদীস মাদ্রাসা

হযরত মাওলানা শামছুল হুদা ছাহেবের দুটি কথা

আমার পরম শ্রদ্ধেয় ওয়ালিদ মাজিদ হযরত মৌলভী ক্বারী মোহাম্মদ আব্দুর রক্বীব ছাহেব ছিলেন একজন খ্যাতনামা ব্যক্তিত্ব, একজন খাটি আল্লাহওয়ালা। তাঁর পীর ও মুর্শিদ হযরত বদরে বদরপুরী (রহ:) এর সাথে তাঁর ক্বলবী নিসবত ছিল খুবই দৃঢ়। তাঁরই মুখে হযরত বদরপুরী (রহ:) এর সুউচ্চ শান ও বিভিন্ন অলৌকিক কার্যাবলী সম্পর্কে ধারণা পেয়েছিলাম সেই শৈশবেই। গভীর রজনীতে মালিক মাওলার দরবারে হাত তুলে আমার ওয়ালিদ ছাহেবের আহাজারী ও কান্নাকাটি আজও যেন শুনতে পাই। তিনি ছিলেন নফছে মুত্বমাইন্নার অধিকারী। শান্ত গম্ভীর একজন সদালাপী ব্যক্তিত্ব। তিনি যদিও বিশিষ্ট কোন ওয়াইজ বা বক্তা ছিলেন না, কিন্তু তাঁর আলাপ-আলোচনার মজলিস খুবই বরকতময় ছিল। তাঁর আলাপ-আলোচনার মজলিসে যারা বসতেন, তারা আলোকিত হতেন। মনের কালিমা ও অস্থিরতা দূরীভূত হত। অপূর্ব এক শান্তনা লাভ করতেন। তাঁর আলাপচারিতার মধ্যে কী যেন এক যাদু নিহিত ছিল। মানুষ সব কিছু ভুলে গিয়ে তম্ময় হয়ে তাঁর আলাপ শুনত। তাঁর আলাপ-আলোচনার বিষয়বস্তু হত শিক্ষণীয় এবং হেদায়াতপূর্ণ। ক্বোরআন শরীফের খেদমত ছিল তাঁর জীবনের প্রধান কর্ম। তাঁর পীর ও মুর্শিদ হযরত বদরপুরী (রহ:) এর উপদেশক্রমে ক্বোরআন শরীফের খেদমতকে তাঁর জীবনের ব্রত করে নিয়েছিলেন। রাখালগঞ্জ দারুল ক্বোরআন আলীয়া মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা মুহতামিম (প্রিন্সিপাল) হিসেবে তিনি আজীবন সাফল্য ও কৃতিত্বের সাথে নিয়োজিত থেকেছেন। তিনি মানুষকে বড়ই ভালবাসতেন। মানুষ ও তাঁকে খুবই ভালবাসত। মেহমানদারী করা তাঁর চরিত্রের একটি বড় বৈশিষ্ট্য ছিল। তাঁর মেধা ছিল খুবই প্রখর। তিনি যদিও কোন কামিল পাশ মাওলানা ছিলেন না, কিন্তু কুতুববীনী

করে এবং বড় বড় আলেম-উলামা, পীর-মাশায়েখের সাথে উঠা বসা করে তিনি দ্বীন ও শরীয়ত সম্পর্কে গভীর জ্ঞানের অধিকারী হয়েছিলেন। অনেক আলেম-উলামাও তাঁর সামনে শরীয়তের মাসআলা-মাসাঈল সম্পর্কে কথা বলার সাহস রাখতেন না। বিশেষ করে এলমে ক্বেরাত সম্পর্কে তিনি সুগভীর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। তিনি মক্কা শরীফে দীর্ঘ ছয় মাস অবস্থান করে হযরত শায়খুল কুররা (রহ:) এর কাছে এলমে ক্বেরাতের চুড়ান্ত শিক্ষা লাভ করেছিলেন। ইলমে মারেফাতেও তিনি সুউচ্চ মাক্বামের অধিকারী ছিলেন। তার প্রমাণ তিনি নিজেই। ইন্তেক্বালের পর তাঁর চেহারা মুবারক থেকে এমন আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছিল, যা দেখে কিছু বৈরী ভাবাপন্ন লোকও বলতে বাধ্য হয়েছিল যে, তিনি আসলেই অনেক উঁচু মাপের ওলী ছিলেন। আমরা তাঁকে চিনতে পারি নাই। ইন্তেক্বালের পর দেখা গেল, কে যেন তাঁর গোটা শরীরকে হলুদ মাখিয়ে দিয়েছে। তাঁর ইন্তেকালে যে শুন্যতা সৃষ্টি হয়েছিল, তা পূরণ হবার নয়। পরম মেহেরবান ও অসীম দয়ালু আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে ফরিয়াদ করি, তিনি যেন আমার ওয়ালিদ মুহতারামের ক্ববরকে জান্নাতের টুকরা বানিয়ে দেন এবং আখেরাতে তিনি যেন তাকে নাবিয়্যীন, সিদ্দীক্বীন, শুহাদা ও সালিহীনের সঙ্গী বানিয়ে জান্নাতুল ফেরদাউসের উচ্চ মাক্বামে স্থান এনায়েত করেন। আমিন।

মোঃ শামসুল হুদা
মুহাদ্দিস, ইছামতি দারুল হাদীস মাদ্রাসা

জনাব মাওলানা নজমুল হুদা সাহেবের দু'টি কথা

نحمده ونصلي على رسوله الكريم

এ নশ্বর পৃথিবীতে মানুষ এক নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য আসে: মেয়াদ শেষে আবার চলে যায়। আত্নীয় স্বজনরা কিছুদিন তাকে তাদের স্মৃতির মণিকোঠায় ধরে রাখে। অত:পর এক সময় বিস্মৃত হয়ে যায়। কিন্তু যে সকল আল্লাহর বান্দাহ পৃথিবীতে আগমনের মূল লক্ষ্য বাস্তবায়নে তৎপর থেকে পার্থিব আরাম-আয়েশ, লোভ-লালসা ইত্যাদির উর্ধে উঠে রিয়াজত, মেহনত এবং সৃষ্টির সেবায় নিয়োজিত থেকে স্বীয় জীবন পরিচালনা করে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন, তাঁরা সৃষ্টির খেদমতের মাধ্যমে অমরত্ব লাভ করে দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়ায় মানুষ তাঁদেরকে আজীবন শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে। অশ্রুসিক্ত নয়নে তাঁদের দরজা বুলন্দির জন্য আল্লাহর দরবারে দোয়া করে। যাঁরা আজীবন নিজেদের চিন্তা না করে কেবল মানুষের খেদমত করে জীবন কাটিয়ে গেছেন এমনি এক মহান বুযুর্গ ছিলেন আমার ওয়ালিদ মুহতারাম হযরত ছিরামপুরী ছাহেব ক্বিবলাহ। তিনি তাঁর গোটা জীবন কেবল মানুষের সেবায় ও কল্যাণে ব্যয় করে গেছেন। আল্লাহর নৈকট্য লাভে তাঁর ঐকান্তিক রিয়াজত ও মেহনত, তাঁর অসাধারণ এখলাছ, নি:স্বার্থ মানব-প্রেম, নিষ্কলুষ সৃষ্টি-সেবা, বেনযীর কোরআনী খেদমত ইত্যাদি আমাদের সবার জন্য অনুকরণীয় ও অনুসরণীয়। এ মহান বুযুর্গের জীবন পর্যালোচনা করে এর বিশেষ দিকগুলো নিজেদের জীবনে প্রতিফলিত করতে পারলে আল্লাহর নৈকট্য ও তাঁর অপার করুণা লাভে ধন্য হওয়া যাবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। স্নেহের পুত্র জুবায়ের আহমদ তার অতি মূল্যবান সময় ব্যয় করে আমার ওয়ালিদ মুহতারামের পর্যালোচনামূলক জীবনী লিখে সত্যিই বিরাট এক খেদমত আঞ্জাম দিয়েছে। আল্লাহ পাক তার জীবনকে ফুলের মত সুন্দর ও বরকতময় করুক, এই নেক

দোয়া রইল। পরিশেষে আমার ওয়ালিদ মুহতারামের রূহের মাগফিরাত ও দরজা বুলন্দি কামনা করছি।

মোঃ নজমুল হুদা
রাখালগঞ্জ ডি, কিউ, আলিম মাদ্রাসা

জনাব হাফিয ফখরুল হুদা (কাতারী) সাহেবের অভিমত

الحمد لله وكفى وسلام على عبادالله الذين اصطفى

নুবুওয়াতের দরজা বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর হেদায়াতের দায়িত্ব পালনে খুলে বেলায়াতের দ্বার। পথহারা মানুষকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনতে যুগে যুগে আল্লাহ অসংখ্য অগণিত আওলিয়ায়ে কেরাম দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন। তাঁরা তাঁদের সাধ্যের সবটুকু উজাড় করে দিয়ে মানুষের কল্যাণের পথে কাজ করে গেছেন। এমনি এক মহান ওলী ছিলেন আমার ওয়ালিদ মুহতারাম হযরত আলহাজ ক্বারী আব্দুর রকীব ছিরামপুরী (রহ:), যিনি তাঁর সারাটি জীবন নিজের কল্যাণে ব্যয় না করে কেবল মানুষের কল্যাণে ব্যয় করে গেছেন। দুনিয়ার সব বাবারাই ভাল। কিন্তু একজন আদর্শ বাবা বলতে যা বুঝায়, তেমন একজন বাবা আমরা পেয়েছিলাম বলে আল্লাহর নিযুত কোটি শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি।

যেহেতু বুযুর্গদের জীবন আমাদের জন্য আদর্শ। তাই তাঁদের জীবনী আলোচনা করা একটি পূণ্যের কাজ। আমার স্নেহের ভাতিজা জুবায়ের আহমদ তার ইংলিশ অনার্স ক্লাসের পড়া-শুনার চাপকে উপেক্ষা করে আমার ওয়ালিদ মুহতারামের জীবন অবলম্বনে মানবিক জীবন গঠনের পথ নির্দেশক যে পর্যালোচনা গ্রন্থ রচনা করেছে, তা সত্যিই একটি মহান কাজ। আমি আন্তরিকভাবে তাকে মুবারকবাদ জানাচ্ছি। দোয়া করি, এর বিনিময়ে আল্লাহ পাক যেন তার জীবনকে একটি আদর্শ জীবনে পরিণত করেন। আমীন

মোঃ ফখরুল হুদা
কাতার

মাওলানা হাফিজ আইনুল হুদা ছাহেবের দুটি কথা

আলহামদুলিল্লাহি,ওয়াছছালাতু ওয়াসসালামু আলা আলা রাসূলিল্লাহ।

যদিও বিশ্বাস করি ছোট বোনের পর বাবার স্নেহ মমতা আমিই সবচেয়ে বেশী পেয়েছি তবুও সন্দেহ নেই আমার, বাবার সন্তানদের মধ্যে আমিই সবচেয়ে অযোগ্য। বাবার স্নেহ-মমতা বেশী পেয়েছি, কারণ তিনি একজন উত্তম বাবা। আর আমি তাঁর ত্যাগের কোন মুল্যায়ন করতে তো পারিইনি, বরং অযোগ্যতায় নিজেকে কলংকিত করেছি। কারণ আমি ছেলে, আমি অধম। আমার ভাইদের মত আমাকে নিয়ে আমার বাবার গর্ব করার মত কিছুই নেই। তবে ছেলে হিসেবে আমি গর্বিত। কারণ বাবার মত একজন বাবা আমি পেয়েছি।

প্রায় কুড়ি বছর হল, মন থেকে বাবার একটি জীবনী লেখার তাগিদ অনুভব করেছিলাম। কিন্তু জানার সীমাবদ্ধতা ও সময়ের স্বল্পতার কারণে তা সম্ভব হয়ে উঠেনি। স্নেহের জুবায়ের আহমদ আমাদের পরিবারের প্রথম সন্তান, বাবার প্রথম নাতী। অনেক কষ্ট করে, সময় দিয়ে বাবার জীবনী লেখার এই দায়িত্ব আঞ্জাম দেয়ায় জুবায়েরের কাছে আমরা পুরো পরিবার চিরদিনের জন্য ঋণী হয়ে গেলাম। আজীবন দোয়া করে যাব, জুবায়েরের ইহ ও পরকাল যেন সুন্দর ও স্বার্থক হয়।

মুহাম্মদ আইনুল হুদা,
নিউয়র্ক

জন্ম

হযরত ছিরামপুরী ছাহেব ক্বিবলাহ সিলেট জেলার ছিরামপুর গ্রামের অধিবাসী শাহ মোঃ আরকান আলী ও বিদুষী নারী রমযান বিবির সর্বকনিষ্ট ছেলে। যতদূর জানা যায়, তিনি ১৩২১ বাংলায় ঐ ছিরামপুর গ্রামেই জন্ম গ্রহণ করেন। বাল্যকালে তাঁর পিতামাতা তাঁর নাম রাখেন আব্দুর রাক্বীব। এটাই মূলত: তাঁর প্রকৃত নাম। তবে ঐ এলাকার লোকজনের কাছে তিনি সোনাফর ক্বারী ছাহেব বলে পরিচিত ছিলেন।

বাল্যকাল

হযরত ছিরামপুরী ছাহেব ক্বিবলাহ (রহ:) এর বাল্যজীবন আমাদের এই প্রজন্মের জন্য একটি অনুস্মরণীয় দিক। মা বাবার উজ্জ্বল আদর্শের বাস্তব প্রতিফলন ঘটেছিল ছাহেব ক্বিবলাহর বাল্যকালেই। পাড়ার অন্যান্য ছেলেদের ন্যায় তিনি চপল স্বভাবের ছিলেন না, বরং খুবই নীরব প্রকৃতির ছেলে ছিলেন তিনি। আমরা যতটুকু জানতে পেরেছি, বাল্যকালে তিনি প্রায়ই চিন্তামগ্ন থাকতেন। মনে হত যেন, তিনি গভীর কোন বিষয় নিয়ে ধ্যানমগ্ন আছেন। পাড়ার ছেলেদের শিশুসুলভ উচ্ছলতা, খেলাধুলা, বিনোদন, সবকিছুই তাঁর কাছে অপছন্দনীয় ছিল। কি জানি, হয়ত বা এই কারণেই মাঝে মধ্যে তিনি হারিয়ে যেতেন। অনেক সন্ধানের পর অবশেষে তাঁকে পাওয়া যেত পার্শ্ববর্তী নীরব, জনকোলাহলমুক্ত অরণ্যের কোন এক বৃক্ষের ডালে একা বসে আছেন। পরে এখান থেকে তাঁকে ঘরে নিয়ে আসা হত।

তাঁর শিশুকালের মার্জিত আচরণ, শিষ্টাচার, বড়দের প্রতি সম্মান- এসব কিছুর মাধ্যমেই তিনি গ্রামের সর্বস্তরের মানুষের মন জয় করে নিয়েছিলেন। অধিকন্তু হযরত শাহ কামাল ইয়ামনী (রহ:) এর বংশধর হিসেবে সেই মহান বংশের আদর্শ ছাহেব ক্বিবলাহর বাল্যকালে সফলভাবেই প্রোথিত হয়েছিল, যা তাঁর পরবর্তী জীবন গঠনে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কারণ বাল্যকাল মানুষের জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ পিরিয়ড। এ সময় যা কিছু শিক্ষা গ্রহণ করা হয় তা জীবনের প্রতিটি পরতে পরতে অক্টোপাশের মত জড়িয়ে যায় এবং পাথরে খোদাই করা তথ্যের ন্যায় স্থায়িত্ব লাভ করে । এ জন্যই জ্ঞানীজনেরা বলে থাকেন- العلم في الصغر كالنقش على الحجر - অর্থাৎ বাল্যকালে জ্ঞানার্জন, যেমন পাথরে চিত্রাঙ্কন। গুণীজনেরা আরও বলেছেন, মাতৃকোল সন্তানের জন্য বিদ্যালয়স্বরূপ। এই বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা যদি সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করেন, তবে ছাত্রগুলো একেকজন আবূবকর, ওমর, উসমান, আলী ও খালিদরূপে সমাজে উদিত হতে পারে।

শিক্ষা জীবন

বাল্যকালে হযরত ছিরামপুরী ছাহেব ক্বিবলাহ (রহ:) হিফজুল কুরআন এর প্রতি মনোনিবেশ করেন। ১৮ পারা হিফজ করার পর তিনি কুরআন শরীফের বিশুদ্ধ পঠনের দিকে ঝুঁকে পড়েন এবং দেশের সুপ্রসিদ্ধ ক্বারীগণের কাছে আল কুরআনুল কারীমের তেলাওয়াত করতে থাকেন। আলহামদুলিল্লাহ, এখন তো দেশের প্রায় স্থানে দারুল ক্বিরাত মজিদিয়া ফুলতলী ট্রাস্ট বা অন্যান্য আরোও বিভিন্ন ধরনের কুরআন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র বিদ্যমান। কিন্তু তখনকার সময়ে এ ধরনের সুযোগ ছিল না। তখন কুরআনে কারীমের তেলাওয়াতের সনদ গ্রহণ করতে হলে দেশের প্রসিদ্ধ ক্বারীগণের সন্ধান নিতে হত। তারপর পদব্রজে অনেক কষ্ট

ভোগের পর সে সকল উস্তাদগণের নিকট উপণিত হয়ে সনদ লাভ করতে হত এবং এ ক্ষেত্রে অনেক সময় অতিবাহিত হয়ে যেত। হযরত ছিরামপুরী ছাহেব ক্বিবলাহের ক্ষেত্রেও এর ব্যাতিক্রম ঘটেনি। প্রতিদিন উস্তাদগণের নিকট প্রত্যুষে অনেক দূর হেঁটে যেতেন, পড়ন্তবেলায় আবার হেঁটে হেঁটে হেঁটে বাড়ি ফিরে আসতেন।

ক্বাবা শরীফ গমন ও ক্বিরাতের সনদ লাভঃ

বয়সের দিক বিচারে হযরত ছিরামপুরী ছাহেবের (রহ:) জীবনে যখন তারুণ্যের বিদায় ঘন্টা বাজল এবং যৌবনের নব আশা, নব উদ্দীপনার সুমধুর গুঞ্জরণ গুঞ্জরিত হল, তখন তিনি পবিত্র হজ্জ পালনের ইচ্ছে করলেন। সে যুগে জাহাজে আরোহণ করে সাগরের উত্তাল ঢেউ জয় করেই তবে মক্কা শরীফ পৌছতে হত। মহান আল্লাহ পাক হযরত ছাহেব ক্বিবলাহর এই পবিত্র ইচ্ছে কৃবূল করলেন। তিনি মক্কা শরীফ পৌছলেন এবং পবিত্র হজ্ব পালন করলেন। এ সময় তিনি মক্কা শরীফে পবিত্র কুরআনে কারীমের সহীহ তেলাওয়াতের তা'লীম গ্রহণে ব্রতী হলেন। তিনি ভাবলেন, এ পবিত্র স্থানে আবার আসার সুযোগ হবে কি না, তা তো বলা যায় না। সুতরাং এ সফরেই পবিত্র কুরআনে কারীমের সহীহ তেলাওয়াতের সনদ নিয়ে বাড়ী ফিরব, ইনশা আল্লাহ। আল্লাহ পাক তাঁর এই ইচ্ছেটাও কৃবূল করলেন। হযরত ছিরামপুরী ছাহেব ক্বিবলাহ (রহ:) অবশেষে কুরআনে কারীমের উচ্চতর সনদ হাসিল করেই তবে বাড়ী ফিরেছিলেন।

ক্বারিউল কুররা উপাধী লাভ:

যতদূর জানা যায়, হযরত ছিরামপুরী সাহেব কিবলাহ ১৬ বৎসর বয়সে হজ্বব্রত পালনের জন্য পবিত্র মক্কা-মদীনা সফর করেন। পবিত্র মক্কায় অবস্থানকালে তিনি মক্কা মুকাররামার একজন শায়খুল কুররার মজলিশে প্রায়ই বসতেন। সেই মজলিশে নোয়াখালির দু'জন ক্বেরাত শিক্ষার্থীদের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছিল। ঐ সময় তিনি ঐ শায়খুল কুররাকে তাঁর প্রকৃত নামে চিনতেন না। তিনি মনে করেছিলেন, ইনি হয়ত উঁচু মানের একজন ক্বারী, ব্যস এতটুকু। এর পর যখন হযরত ছিরামপুরী ক্বারী সাহেব ক্বিবলাহ (রহ:) মসজিদুল হারামে অনেক লোকের সমাগম দেখলেন, যেখানে কুরআনুল করীমের তেলাওয়াতের প্রশিক্ষণ চলছে, এ সময় তিনি লোকজনের মুখে শুনলেন যে, শায়খুল কুররা সাহেব উপস্থিত হচ্ছেন। হযরত ছিরামপুরী সাহেব ইতিপূর্বে শায়খুল কুররার প্রসিদ্ধির কথা শুনেছিলেন, কিন্তু স্বচক্ষে তাঁকে দেখেননি। ঐ সময় মাহফিলে নোয়াখালির ঐ লোক দু'জনের সাথে তাঁর দেখা হল। তিনি তাঁদেরকে বললেন, ভাই! শায়খুল কুররা সাহেব নাকি এখানে এসেছেন। দয়া করে আমাকে দেখিয়ে দিন। তাঁরা ইশারায় একজন লোককে দেখিয়ে দিলেন, যিনি ঐ মাহফিলেই সবার সাথে মিলে মিশে বসেছিলেন। সুতরাং হযরত ছিরামপুরী সাহেব ঐ মাহফিলে গিয়ে বসলেন। উপস্থিত লোকজন তখন একজন একজন করে কুরআনুল করীমের তেলাওয়াত করছিলেন। এক পর্যায়ে হযরত ছিরামপুরী সাহেবের পালা আসল। তিনিও তেলাওয়াত করলেন। মাহফিল এদিনকার মত শেষ হয়ে গেল।

পরের দিন রাতে একই সময়ে মাহফিল আবার বসল। ঐ রাতে শায়খুল কুররা হযরত

ছিরামপুরী সাহেবকে চিনে ফেললেন। কারণ আগের দিন তিনি তাঁর তেলাওয়াত শুনে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। সাক্ষাৎ হওয়া মাত্রই তিনি বললেন, শায়খ! আপনি একটু তেলাওয়াত করুন। তিনি তেলাওয়াত করে শুনালেন। তেলাওয়াত শেষে ছিরামপুরী সাহেব শায়খুল কুররাকে কিছু তেলাওয়াত শুনানোর জন্য অনুরোধ জানালেন। তিনি তেলাওয়াত করে শুনালেন। অবশেষে শায়খুল কুররা সাহেব তাঁকে তাঁর অফিসে দাওয়াত করলেন। ছিরামপুরী সাহেব তাঁর দাওয়াত কবুল করলেন। পরের দিন তিনি শায়খুল কুররার অফিসে গিয়ে সাক্ষাৎ করলেন। শায়খ সাহেব তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিলেন। যাক শুরু হল তাঁদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা। হযরত শায়খুল কুররা তাঁকে তাজবীদের বিভিন্ন বিষয়াদি জিজ্ঞেস করলেন। তিনি সেগুলোর জবাব দিলেন। কিন্তু একটি বিষয়ে তাঁদের দু'জনের মধ্যে বিরোধ দেখা দিল। অবশেষে হযরত শায়খুল কুররা (রহ:) তাজবীদ শাস্ত্রে তাঁর অসাধারণ পান্ডিত্য অবলোকন করে তাঁকে কারিউল কুররা উপাধীতে ভূষিত করলেন এবং 'শাত্বী' নামক তাজবীদের একখানা মাশহুর কিতাব তাঁকে উপহারস্বরূপ দান করলেন।

ক্বেরাতের সনদ

হযরত ছিরামপুরী ছাহেব ক্বিবলাহ (রহ:) মূলতঃ ইমাম হাফস্ (রহ:) এর বর্ণিত ক্বিরাতের সনদ লাভ করেছিলেন, যা ইমাম শাত্বী (রহ:) থেকে শুরু হয়েছিল। জনাব ছিরামপুরী ছাহেব ক্বিবলাহ (রহ:) এর ক্বিরাতের প্রথম উস্তাদ ছিলেন শায়খ মুহাম্মদ আব্দুল খালিক্ব সিন্ধী (রহ:)। তাঁর উস্তাদ ছিলেন শায়খ হাফিজ মুহাম্মদ মাহমুদ মক্কী (রহ:), যিনি মাদরাসায়ে ঈদিয়্যাহ এর স্বনামধন্য উস্তাদ ছিলেন। হযরত ছাহেব ক্বিবলাহ (রহ:) এর দ্বিতীয় উস্তাদ ছিলেন শায়খ হাফিজ ফখরুল আযম (রহ:), যিনি মক্কা মুকাররামার মাদরাসায়ে সূলিয়্যাহ এর প্রথম সারির উস্তাদ ছিলেন। তিনি ক্বিরাতের সনদ লাভ করেন শায়খ ইব্রাহীম সাদ ইবনে আলী মিশরী (রহ:) থেকে। তিনি সনদ লাভ করেন শায়খ মুহাম্মদ আল মুতাওয়াল্লী (রহ:) থেকে। তিনি সনদ লাভ করেন শায়খ আহমদ সালমূনাহ (রহ:) থেকে। তিনি সনদ লাভ করেন শায়খ সায়্যিদ ইব্রাহীম আল আবিদী (রহ:) থেকে। তিনি সনদ লাভ করেন কয়েকজন শায়খ থেকে। তন্মধ্যে একজন হলেন শায়খ আব্দুর রহমান আল আযহারী (রহ:)। তিনি সনদ লাভ করেন কয়েকজন শায়খ থেকে এবং সেই সনদ পর্যায়ক্রমে রাসুলে কারীম (সা:) পর্যন্ত পৌছেছে। শায়খ আব্দুর রহমান আল আযহারী (রহ:) এর সনদের ধারা বর্ণনা নিম্নে উদ্ধৃত হল:

শায়খ আব্দুর রহমান আল আযহারী (রহ:) ক্বিরাতের সনদ লাভ করেন শায়খ আহমদ আল বাক্বারী (রহ:) থেকে। তিনি সনদ লাভ করেছেন শায়খ মুহাম্মদ আল বাক্বী (রহ:) থেকে। তিনি সনদ লাভ করেছেন শায়খ আব্দুর রহমান ইয়ামানী (রহ:) থেকে। তিনি সনদ লাভ করেছেন তাঁর ওয়ালিদ মুহতারাম শায়খ শাহাজাহ (রহ:) থেকে। তিনি সনদ লাভ করেছেন বিভিন্ন শায়খগণ থেকে। যেমন- শায়খ আব্দুল হক্ব আস্ সানবাতী (রহ:), শায়খ যাকারিয়া আনসারী (রহ:), শায়খ রিদ্বওয়ান আল আক্বাবী (রহ:), শায়খ মুহাম্মদ নুওয়াইবী (রহ:), শায়খ মুহাম্মদ আল জাযারী (রহ:), শায়খ ইমাম আল আযহার ইবনে

লুবান (রহঃ), শায়খ আহমদ সিহরী (রহ:), শায়খ আবুল হাসান আলী ইবনে হুযাইলী (রহ:), শায়খ আবু দাউদ সুলাইমান ইবনে নাজাহ (রহ:), শায়খ উসমান ইবনে উমর আদ দানী (রহ:), শায়খ আবুল হাসান ত্বাহির ইবনে গালবুন আল মুক্বরী (রহ:), শায়খ আবুল হাসান আলী ইবনে মুহাম্মদ ইবনে সালেহ আল হাশেমী (রহ:), শায়খ আল আব্বাস আহমদ ইবনে সাহল (রহ:), শায়খ ইবনে মুহাম্মদ উবাইদ ইবনে আস সাব্বাহ (রহ:)। শায়খ ইমাম আসিম ইবনে আবিন নুযুদ আত তাবেয়ী (রহ:), শায়খ যার বিন হাবাশী আল আসাদী (রহ:), শায়খ আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর আস সুলামী (রহ:)। তিনি আবার কয়েকজন সাহাবী (রা:) থেকে ক্বিরাতের সনদ লাভ করেন। তাঁরা হলেন- হযরত উসমান (রা:), হযরত আলী (রা:), হযরত যায়েদ বিন সাবিত (রা:), হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ(রাঃ) এবং হযরত উবাই বিন কা'ব (রাঃ)। উপরোক্ত সাহাবীগণ নবী করীম (সাঃ) এর কাছ থেকে কুরআনে কারীমের বিশুদ্ধ পঠনের শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন এবং যাঁরাই তাঁদের কাছে এই মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছেন, তাঁদের কাছে পূর্ণ সতর্কতার সাথে এই আমানত অর্পণ করেছেন।

খেলাফত লাভ

এটা সে সময়কার কথা, যখন বাংলাদেশ পরিচয়ের কোন দেশ এই বিশ্বের মানচিত্রে ছিল না। বর্তমান ভারতের বদরপুর আর বাংলাদেশের সিলেট তখন একই ভারতবর্ষের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তখন বদরপুর ও পার্শ্ববর্তী শহরগুলোর পীর ছিলেন হযরত আল্লামা ইয়াকুব বদরপুরী ছাহেব (রহ:)। আর এদিকে সিলেটসহ পার্শ্ববর্তী শহরগুলোর পীর ছিলেন কৌড়িয়ার হযরত আল্লামা আব্বাছ আলী ছাহেব (রহ:)। এই দুই ওলীর সুপরিচিতি তখন চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। বিশেষ করে হযরত বদরপুরী ছাহেব ক্বিবলাহ (রহ:) সিলেটে প্রায়ই আসতেন। সেই সুবাদে হযরত ছিরামপুরী ছাহেব (রহ:) তাঁর সাথে মোলাক্বাত করতেন। তাঁর বিভিন্ন মাহফিলে মুল্যবান নসীহত শুনার জন্য যেতেন। আমরা জানি, يعرف ولي وليا بالكشف অর্থাৎ "আল্লাহর একজন ওলী আরেকজন ওলীকে কাশফের সাহায্যে সহজে চিনতে পারেন"। আর সে কারণেই হযরত বদরপুরী ছাহেব ক্বিবলাহ (রহ:) হযরত ছিরামপুরী ছাহেব (রহ:) কে প্রথমত: তাঁর সুযোগ্য মুরীদানদের অন্তর্ভুক্ত করে অবশেষে তাঁর সুযোগ্য খলীফা নির্বাচিত করেছিলেন, যেমনটি করেছিলেন তাঁর জামাতা সিলেটের ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ (রহ:) কে।

ইমাম হিসেবে হযরত ছিরামপুরী (রহঃ)

তখন ছাহেব ক্বিবলাহর যশ ও খ্যাতি বিশেষ করে তাঁর স্বর্গীয় কোরআন শরীফ তেলাওয়াতের প্রসিদ্ধি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। এরই ধারাবাহিকতায় ফেঞ্চুগঞ্জের মানিক কোনার লোকজন সিদ্ধান্ত নিলেন যে, যে করেই হোক ক্বারী ছাহেবকে আমাদের গ্রামে দাওয়াত করে নিয়ে এসে একদিন কোরআন তেলাওয়াতের আসর বসাতে হবে। গ্রামের কয়েকজন গণ্যমান্য লোক শেখপুর গিয়ে হযরত ছাহেব ক্বিবলাহর সাথে সাক্ষাত করে তাদের গ্রামে তশরীফ আনার জন্য দাওয়াত করলেন এবং তাঁর কাছে তারা তাদের ইচ্ছার কথা প্রকাশ করলেন। তিনি তাদের ইচ্ছার মুল্যায়ন করলেন। হযরত ছাহেব ক্বিবলাহ

মানিককোনায় আসলেন। মধুমাখা কণ্ঠে কুরআনের বাণী শুনালেন। মানিককোনার জনগণ মুগ্ধ হলেন। তখন তাদের মধ্যে অন্য বাসনা উদিত হল। গ্রামবাসী সবাই হযরত ছিরামপুরী সাহেবকে তাদের ইমাম হিসেবে পেতে সিদ্ধান্ত নিলেন। তাদের পক্ষ থেকে হযরত ছিরামপুরী ছাহেব (রহ:) এর কাছে অনুরোধের পর অনুরোধ ঝরে পড়তে লাগল এই মর্মে যে, যে করেই হোক আমরা আপনাকে আমাদের মানিককোনায় ইমাম ছাহেব হিসেবে পেতে চাই। হযরত ছিরামপুরী ছাহেব ক্বিবলাহ (রহ:) তাদের ব্যাকুল কণ্ঠের এই অনুরোধ উপেক্ষা করতে পারলেন না। ইমাম হিসেবে তিনি সেখানে থেকে গেলেন। এতে গ্রামবাসী এতই আনন্দিত হলেন যে, ছিরামপুরী ছাহেব (রহ:) কে তারা প্রতি মাসে হাদিয়া বাবত পাঁচ টাকা দেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। সে সময় একজন ইমাম ছাহেবের জন্য প্রতিমাসে এতটাকা হাদিয়া গ্রহণ করার কোন সুযোগ ছিল না। বেশী হলে তিন টাকা। এর বেশী নয়। অন্যান্য ইমাম ছাহেবগণ এ সংবাদে বেশ আশ্চর্যান্বিত হলেন। তাঁরা পাঁচ টাকা হাদিয়াওয়ালা ইমাম সাহেবকে এক নজর দেখার জন্য আসতে লাগলেন। কেউ বা তাঁকে দেখে, তাঁর সৌম্য সুন্দর চেহারা দর্শনে এবং তাঁর সান্নিধ্যের পরশ পেয়ে ধন্য হলেন। কেউ বা তাঁর দেখা না পেয়ে গ্রামের লোকদের জিজ্ঞাসা করে তন্ময় হয়ে শুনে গেলেন অনেক কথা, অনেক কাহিনী। হয়ত বা তারা ফেরার পথে ভাবছিলেন, আল্লাহ চাহে তো দ্বিতীয়বারের সফরে তাঁকে এক নজর দেখার প্রত্যাশা পূর্ণ হবে।

হযরত ছিরামপুরী ছাহেব ক্বিবলাহর ছিল দরাজ দীল। কথা বলতেন খুবই ধীরে, বড়ই সুন্দর করে, সাজিয়ে গুছিয়ে। কথা বলার সময় মৃদু হাসিতে উদভাসিত হয়ে যেত তাঁর পৌরষদীপ্ত চেহারাখানি। স্বর্গীয় সুষমায় প্রস্ফুটিত বদনের প্রতিটি রেখায় রেখায় শুরু হত মুচকি হাসির সুকোমল মৃদু উৎসব। শ্রুতামন্ডলী মুগ্ধ না হয়ে পারতেন না। ছাহেব ক্বিবলাহর কাছে ধনী-গরীব সবাই ছিল সমান। সবার প্রতি তাঁর ছিল সমান আচরণ। প্রথম সাক্ষাতেই তিনি আগন্তুকের সাথে এমন আচরণ করতেন, মনে হত, এ যেন নুতন কোন পরিচয় নয়, বরং বহু দিনের চেনা জানা লোকের সাথে বিনয়ী ও সাবলীল কথোপকথন। আল্লাহর ওলীদেরকে মানুষ অনেকদিন মনে রাখে। তাঁদের স্মৃতি মন্থন করে কাঁচের ন্যায় স্বচ্ছ আকাশে পরিতৃপ্তি, নির্ভরতা আর অনুপ্রেরণার ডানা মেলে ভেসে বেড়ায়। সে স্মৃতি মন্থনকালে কখনো বা মুচকি হাসির রেখা আপন মনে ফুটে উঠে তাদের অধরে। কখনো বা আপন, অতি আপন কিছু হারানোর অসহ্য বেদনায় বুকের ভেতরটা কেমন জানি ফাঁকা হয়ে উঠে। অস্থিরতা আর আবেগ মিশে একাকার হয়ে চোখে আসে বেদনাময়ী জ্বালা, কখনো বা উদাসী মনের অপলক নেত্র আশ্রয় খোঁজে ফিরেদিগন্তের শূন্যতায়।

বদরপুরী (রঃ) এর খলীফাদের বৈশিষ্ট্য

হযরত শাহ ইয়াকুব বদরপুরী (রহঃ) এর খলীফাদের বৈশিষ্ট্য ছিল, তাঁরা একদিকে যেমন আলেমে দ্বীন ছিলেন ঠিক তেমনি ছিলেন মুখলিছ আমেল। ইলমের বিশাল বিশাল ক্ষেত্র হয়ত তাঁদের ছিল না, তদুপরি যতটুকু ইলিম ছিল তার উপর আমল করার ক্ষেত্রে তাঁরা ছিলেন বদ্ধপরিকর। আর এখলাছ তথা নিষ্ঠা ছিল তাঁদের অন্যতম বৈশিষ্টা। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين এবং فاعبد الله مخلصا له الدين - له الدين উক্ত আয়াতদ্বয়ে এখলাছ তথা নিষ্ঠার সাথে আল্লাহর এবাদতের কথা বলা হয়েছে। হাদীস শরীফে এসেছে: أخلص دينك يكفك القليل من العمل অর্থাৎ "তুমি

এখলাছের সাথে তোমার দ্বীন পালন কর তাহলে অল্প আমলই তোমার জন্য যথেষ্ট হবে"। তাঁদের আরেকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ছিল যে, তাঁরা সবাই আহলুসসুন্নাত ওয়াল জামা'তের আক্বিদাহ-বিশ্বাস পোষণ করতেন। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁরা এই আক্বিদায় ছিলেন হিমালয়ের মত অটল ও অবিচল। সুতরাং ইলিম, আমল ও সহীহ আক্বিদার অপূর্ব সমন্বয় সাধন ছিল তাঁদের বৈশিষ্ট্য। হযরত ছিরামপুরী (রহঃ)ও হযরত বদরপুরী (রহঃ) এর নিবেদিত প্রাণ খলীফাগণের একজন ছিলেন বিধায় তিনিও সেই সুমহান বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন।

হযরত বদরপুরী (রহঃ) এর আস্থাভাজন খলীফা

বৃহত্তর সিলেটে তখন হযরত বদরপুরী (রহঃ) এর খলীফা হওয়ার সৌভাগ্য অল্প কয়েকজনেরই হয়েছিল। সেই সৌভাগ্যবান মহা পুরুষগণ হলেন, তয়বকামাল নিবাসী জনাব হাফিজ মুযাম্মিল আলী (রহঃ), বড়লেখা নিবাসী জনাব কারামত আলী (রহঃ), কুলাউড়া নিবাসী জনাব হাফিজ আপ্তাব খান (রহঃ), জনাব আল্লামা আব্দুল লত্বীফ চৌধুরী ছাহেব কিবলাহ ফুলতলী (রহঃ) ও জনাব কারী আব্দুর রকীব ছিরামপুরী (রহঃ) প্রমূখ।

হযরত বদরপুরী (রহঃ) তাঁর কাছে বয়াত হতে ইচ্ছুক প্রত্যন্ত অঞ্চলের ব্যক্তিবর্গের কাছে বয়াত গ্রহণের দায়িত্ব দিয়ে বিভিন্ন খলীফাগণকে প্রেরণ করতেন। একবার তিনি সংবাদ পেলেন যে, আসাম প্রদেশের লোকজন তাঁর কাছে বয়াত গ্রহণের জন্য বড়ই উন্মুখ হয়ে বসে আছেন। সে সময় বিভিন্ন কারণবশতঃ আসাম প্রদেশে তাঁর যাওয়ার সম্ভব ছিল না। যেহেতু হযরত ছিরামপুরী(রঃ) তাঁর কাছে অত্যন্ত আস্থাভাজন ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তাই তাঁকেই তিনি দায়িত্ব দেন।

বিবাহ

হযরত ছিরামপুরী ছাহেব (রহ:) তখন দ্বীনের কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। কৌড়িয়ার পীরে কামিল আল্লামা আব্বাস আলী ছাহেব (রহ:) এর সাথে হযরত ছিরামপুরী ছাহেবের অনেক পূর্ব থেকেই পরিচয় ছিল। কারণ হযরত ছিরামপুরী ছাহেব প্রায়ই কৌড়িয়ার পীর ছাহেবের বিভিন্ন মাহফিলে যেতেন এবং তাঁর সাথে দেখা করতেন। কৌড়িয়ার ছাহেব (রহ:)ও তাঁকে অত্যন্ত তা'যীম করতেন। হযরত ছিরামপুরী ছাহেবের অপূর্ব সুন্দর চেহারা, শ্রদ্ধাবনত বিনয়ী আচরণ, চমৎকার সুরের তেলাওয়াত, জ্ঞানগর্ভ কথোপকথন ও সর্বোপরি তাঁর তাক্বওয়া অবলোকন করে অত্যন্ত প্রীত হয়ে অবশেষে তিনি তাঁকে তাঁর সর্বকনিষ্ট মেয়ের জামাতা বানানোর সিদ্ধান্ত নিলেন। হযরত আব্বাস আলী ছাহেব (রহ:) এর একটি বিশেষ গুণ ছিল, যখনই তিনি কোন সুযোগ্য মুত্তাক্বী আলেমে দ্বীনের সন্ধান পেতেন, তাঁর কাছে সরাসরি তাঁর মেয়ের বিয়ের প্রস্তাব পেশ করতেন। যাক, হযরত আব্বাস আলী ছাহেব (রহ:) হযরত ছিরামপুরী ছাহেবের কাছে তাঁর এই সুপ্ত বাসনা প্রকাশ করেন। প্রস্তাব শুনে হযরত ছিরামপুরী ছাহেব (রহ:) এর মধ্যে এক ধরনের ভীতিকর অবস্থা বিরাজ করল এ কথা ভেবে যে, অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ পরিবারের এই মেয়েকে তিনি কী করে তাঁর অতি সাধারণ ঘরে নিয়ে রাখবেন। এই কথা ভেবে তিনি কোন উত্তর করলেন না। এদিকে কোন জবাব না পেয়ে কয়েকদিন পর হযরত আব্বাস আলী ছাহেব (রহ:) আবারও তাঁর সামনে প্রস্তাবটি উত্থাপন করলেন। এবারেও ছিরামপুরী ছাহেব (রহ:) নিরুত্তর, কী জবাব দেবেন, খুঁজে

পাচ্ছিলেন না। তৃতীয়বার যখন কৌড়িয়ার ছাহেব বিষয়টি তুলে ধরলেন তখন আর চুপ না থেকে বললেন, জনাব! আমার বাড়ি ঘরের বর্তমান যে পরিস্থিতি তাতে আপনার পর্দানশীন মেয়েকে সেখানে নিয়ে যেতে আমার বিলকুল সাহস হচ্ছে না। তাই অনেক ভেবে চিন্তে আমি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, পবিত্র হজ্ব ব্রত পালন করে এবং নুতন বাড়ি কিনে তারপর আল্লাহ চাহে তো এই বিষয়টির সুরাহা করব। জবাব শুনে হযরত আব্বাস আলী ছাহেব (রহ:) কতক্ষণ নীরব থেকে বললেন, ঠিক আছে, তাই হোক। এরপর তিনি এক মাহফিলে তাঁর মুরীদানদের উদ্দেশ্য করে বললেন, আমার ছিরামপুরী ছাহেব (উল্লেখ্য, এই মাহফিলের মুরীদানদের সবাই ছিরামপুরী ছাহেবকে ভালভাবেই চিনতেন।) পবিত্র হজ্ব ব্রত পালনের ইরাদা করেছেন। তো এ রকম এক মহান কাজে আমরা কি তাঁকে একটু সাহায্য করতে পারি না? এ কথা বলেই তিনি তাঁর পকেট থেকে (প্রায়) চল্লিশ টাকা বের করে সামনে রাখলেন। আল্লাহর এক মাক্‌বুল ওলী প্রথমেই হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন দেখে উপস্থিত লোকজন বিনা বাক্যে অত্যন্ত সন্তুষ্ট চিত্তে টাকা দিতে লাগলেন। তৎকালীন সময়ে হজ্ব করতে ১৬০০ টাকার প্রয়োজন হত। কিন্তু, সুবহানাল্লাহ! জমাকৃত টাকার পরিমাণ দাঁড়ালো ১৬০০ এর অনেক উপরে। চিন্তায় পড়ে গেলেন হযরত ছিরামপুরী ছাহেব ক্বিবলাহ (রহ:)। এত টাকা দিয়ে তিনি কী করবেন? ছুটলেন হযরত আব্বাস আলী ছাহেব ক্বিবলাহ (রহ:) এর কাছে। তিনি বললেন, চিন্তার কোন কিছু নেই। আপনার তো নুতন বাড়ি তৈরীর ইরাদা আছে। সুতরাং বাকী টাকা দিয়ে আপনি সে কাজটিই সমাধা করবেন। হযরত ছিরামপুরী ছাহেব (রহ:) পবিত্র হজ্বব্রত পালনের উদ্দেশ্যে মক্কা শরীফ গমন করলেন, ফিরে এসে পর্দার অনুকুল পরিবেশের আলোকে নুতন বাড়ি তৈরী করলেন এবং যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে পরিশেষে তিনি বিবাহ করলেন।

মহান শিল্পীর এক অনুপম সৃষ্টি

আমরা জানি, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এক অতুলনীয় শিল্পী। মানুষকে তিনি তার পছন্দসই আপন ক্যানভাসের তুলিতে অনুপম রূপে রূপ দান করে সৃষ্টি করেছেন। তিনি তো বলেছেন- تبارك الله أحسن الخالقين - মানুষ কথা বলে বড়ই সুন্দর করে, মোহনীয় ভঙ্গিতে, যাদু মিশিয়ে। মানুষ হাসে, সে হাসিতে ঝরে পড়ে সঞ্জিবনী নির্যাস। সুবহানাল্লাহ! সেই মহান স্বত্তা কতই না সুন্দর, যিনি মানব সৃষ্টি করেছেন সৌন্দর্যের অপার মহিমায়। ক্যানভাস তাঁর কতই না সমৃদ্ধ ও রহস্যময়, যিনি আপন সুরে, আপন মনে, মনের মাধুরীতে ঝড় তোলে সৃজনে সৃজনে ঘটিয়েছেন পরিতৃপ্তির সফল প্রকাশ। তাঁর ইচ্ছা কতই না বিচিত্র, যিনি যাকে যেমন রূপ দিয়েছেন তা তেমনই হয়েছে। তিনি তো বলেই দিয়েছেন- فعال لما يريد (Extreme doer of whatever he wants) তিনি তো এমন এক মহান স্বত্তা, যিনি অতুলনীয়, অপরিমেয় শক্তির আঁধার। তিনি তো বলেছেন- كن فيكن (Be. it has been) - হযরত ছিরামপুরী ছাহেব (রহ:) কে আল্লাহ পাক খুবই সুন্দর আকৃতিতে সৃষ্টি করেছিলেন। দীর্ঘদেহী, বাবরীকেশী, সুঠাম দেহের অধিকারী একজন অনন্য মানুষ ছিলেন হযরত ছিরামপুরী ছাহেব ক্বিবলাহ (রহ:)। শুধু তাই নয়, আমরা সবাই জানি, মানুষের সৌন্দর্য তখনই ষোলকলায় পূর্ণ হয়, যখন সেথায় ব্যক্তিত্বের ভাবের হয় আদান প্রদান। জীবনের সাবলীলতার প্রস্রবণ সে সৌন্দর্যকে করে বিকশিত ও মহিমান্বিত। হযরত ছিরামপুরী ছাহেব (র) এর মধ্যে দৈহিক ও আত্মিক সৌন্দর্যের যে সমন্বয় ঘটানো হয়েছিল

তা সত্যিই অপরূপ, নিঃসন্দেহে বিস্ময়কর।

এক মহান মুসাফিরের গল্প

মানব জীবন সংক্ষিপ্তকালের এক সফর বৈ কিছু নয়। জীবনের বাঁকে বাঁকে এক মুসাফির দেখা পায় আরেক মুসাফিরের। একে অপরের কাছে পৌছিয়ে দেয় শান্তির অমৃত সুধা আর হেদায়াতের বাণী। তৃপ্তি, মুগ্ধতা, সহাস্য বদনের সুপেয় অমৃত সুধা, নজরকাড়া মোহনীয় ভাবের আদান প্রদান, সুপুরুষোচিত বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের প্রকাশ একে অপরকে নিয়ে আসে কাছে, আরো কাছে। হৃদয়ের সাজানো ঢালি মেলে ধরে মুখর হয়ে বলা চলে জীবন সফরের হাসি-কান্না মিশ্রিত, সুহাস্য নয়তো হৃদয়ের দখিনা হাওয়ায় ভেসে আসা সুকরুণ গল্প। হযরত ছিরামপুরী ছাহেব (রহ:) এর বেলায়ও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। জীবন চলার পথে ক্ষণিকের তরে হলেও কত পথিকের সাথেই না তাঁর মোলাকাত হত। তিনি মিশতেন অবলীলায়। সরলতায় পূর্ণ ছিল তাঁর মন। ভাবের মনিকোঠায় প্রেম আর সহানুভতিকে তিনি সাজিয়ে রেখেছিলেন থরে থরে। পথিকের সম্মুখে তিনি মেলে ধরতেন হৃদয়ের হেফাজতখানায় রক্ষিত তাঁর সুপ্রিয় সিন্দুকটি। পথিক মুগ্ধ হয়ে যেত। সুমহান উদারতার আলোকে উদ্ভাসিত ডেফোডিলের ন্যায় ক্ষণিকের এই মোলাকাতকে পথিক আলগোছে রেখে দিত তার স্মৃতিঘরের সুসজ্জিত কামরায়। হযরত ছিরামপুরী ছাহেব ক্বিবলাহ (রহঃ) আজ এ আপাতঃ সুন্দর ধরণীতে নেই। তবুও মানুষের সেই স্মৃতিঘরের বারান্দায় শুনা যায় তাঁর নির্ভীক বিচরণ। সেসব পথিকদের অনেকেই হয়ত সেই একই পথের যাত্রী হয়ে পাড়ি জমিয়েছেন সেই মহা সত্যের, মহা বাস্তবতার সাথে মোলাক্বাতের তরে। কিন্তু যারা বেঁচে আছেন আজ অবধি, স্মৃতিঘরের সেই সুসজ্জিত কামরায় ঢুকলেই তারা শুনতে পান সেই মোহনীয় সুর। হৃদয়ের আয়নায় ভেসে উঠে সেই সৌম্য সুন্দর অবয়ব। চোখে চলে আসে তখনই ঝাপসা ভাব। বড়ই ব্যাকুল হয়ে কপোল বেয়ে টপটপ ধ্বনি তোলে গড়াগড়ি খায় দু' ফুটো তপ্ত জল। বার বার তখন তাদের মনে অশ্রুসিক্ত এক প্রার্থনা এসে বাসা বাঁধে। 'আল্লাহ তাঁকে সর্বোত্তম প্রতিদান দান করুন, আমিন'।

যুগে যুগে কোরআন তেলাওয়াতের প্রচন্ড আকর্ষণ

ক্বোরআনে পাক মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর প্রিয় মাহবুব নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে প্রেরিত সর্বোত্তম উপহার। এতে রয়েছে সকল বৈজ্ঞানিক জিজ্ঞাসার সুষ্ঠু সমাধান। ক্বোরআনে কারীমকে বলা হয়েছে- تبيانا لكل شئ - ক্বোরআনে পাককে বলা হয়েছে হাকীম, প্রজ্ঞাময়। এর জিম্মাদার সেই পরাক্রমশালী সত্তা, যিনি এই ঐশী বাণীকে করেছেন সর্বকালীন, সার্বজনীন। শুধু জিজ্ঞাসার সমাধানে নয়, বরং এর ভাষাশৈলী, নান্দনিক কারুকার্য ও শ্রেণী বিন্যাস ইহাকে শ্রুতামন্ডলীর নিকট মোহনীয়, স্মরণীয় ও বরণীয় করে তোলে। এমন ঐশী গ্রন্থের বিকল্প অনুসন্ধান ঐ ঐশী বাণী অস্বীকারেরই নামান্তর। সেই পরম সত্তা তো চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছেন বিশ্ববাসীর দরবারে, পারো তো নিয়ে এস না এমন ঐশী গ্রন্থের বিকল্প। রাসুলে মাক্ববুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবদ্দশায় কুরআনে কারীমের তেলাওয়াতের যাদুময়ী পরশের অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। নবীয়ে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন ক্বোরআন তেলাওয়াত করতেন, কাফিরেরা এর ভাষাশৈলী, শব্দালংকার ও বাক্যালংকারের প্রাচুর্য অবলোকন করে ভেতরে ভেতরে মুগ্ধ হয়ে যেত। তারা বুঝতে পেরেছিল এমন ঐশী বাণীর বিজয়কে কখনও

প্রতিহত করা যাবে না। তবুও তারা একে অপরকে নিষেধ করে বলত, পাগলের প্রলাপ শুনো না। এতদসত্ত্বেও সুমধুর স্বরের তেলাওয়াত শ্রবণের লোভ সইতে না পেরে অবশেষে তারা নিজেরাই আড়ালে আবডালে, লুকিয়ে লুকিয়ে শুনত আল ক্বোরআনের সুমধুর তেলাওয়াত। বৃক্ষরাজী, তরু-লতা আর প্রকৃতি যেন নিজেদের কাজ ফেলে রেখে নীরব নিথর হয়ে পান করত ক্বোরআনে কারীমের সুমধুর তেলাওয়াতের অমীয় সুধা।

রাসুলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তিরোধান ঘটল। তবুও শেষ হয়ে যায়নি সেই সুমধুর ধ্বনি। শ্রোতার রন্ধ্রে রন্ধ্রে জাগিয়ে তোলা সেই যাদুকরী পরশ। প্রাকৃতিক ভাবের ভুবনে ফেলে দেয়া সেই সম্মোহনী শক্তি। আজও মুমিন, মুসলমান একমনে করে যায় তেলাওয়াত। মানুষ কী যে এক আকর্ষণে ছুটে আসে, কী যে এক স্বর্গীয় অপূর্ব নেশা জাগে তাদের নয়নযুগলে। তন্ময় হয়ে শুনে যায় সেই মোহিনী সুরের মূর্চ্ছনা। কি হিন্দু, কি মুসলমান, কেউ বা প্রকাশিত, কেউ বা অনুচ্চ কন্ঠে, আবার কেউ বা ঘোর লাগা কন্ঠে বলে উঠে, আহ! এই তো, এই তো স্বর্গীয় সুখের উল্লাস, শান্তি সুখের ঠিকানা। মুমিনের হৃদয়ে প্রবল থেকে প্রবলতর হয় সাইক্লোন, তছনছ হয়ে যায় পাপ-পংকিলতার আবাসন, বেড়ে চলে মহান আল্লাহ তায়ালার প্রতি নির্ভরতার জয়গান। মুমিন-হৃদয়ে শত শত ধ্বনি তোলে হেদায়াতের বিজয় নিশান।

তেলাওয়াতের সুরে সুরে হিন্দু লোকের অশ্রু ঝরে

সমাজে ক্বারী হিসেবেই হযরত ছিরামপুরী ছাহেব (রহঃ) এর ছিল মূল পরিচিতি। মক্কা শরীফ থেকে ক্বেরাতের সনদ নিয়ে যখন তিনি দেশে ফিরলেন তখনও তিনি বয়সে কুচকুচে কালো শশ্রু মন্ডিত টগবগে এক সুদর্শন যুবক। তিনি আসলেন, শুরু করলেন ক্বোরআন তেলাওয়াতের শিক্ষাদান। মধুমাখা কন্ঠ, দীর্ঘশ্বাসে তেলাওয়াতের অবাক করা নৈপুন্য। মুখে মুখে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল তাঁর সুমধুর স্বরের সুখ্যাতি। শুরু হলো জনগণের আগমন। কেউ বা হরষিত মনের খোরাক যোগানোর মানসে, আবার কেউ বা তাঁর শিষ্যত্ব লাভের আশায়। সুললিত সুরে সুরে ক্বোরআনের দ্যুতি দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল প্রতিটি ঘরে ঘরে। সে যেন এক অনুপম দীপশিখা। ধীরে ধীরে সেই সুর বেজে উঠল অমুসলিমের মুখে। কেউ বা তন্ময়, কেউ বা অধীর হল শুধু শুনে শুনে। আবার কারো বা নয়নের জল বেয়ে গড়াগড়ি খেল ভূতলে, নিজেরই অজান্তে।

হযরত ছিরামপুরী ছাহেব (রহঃ) এর প্রতিষ্ঠান গড়নের এক অদম্য মহান বাসনা ছিল, যেখানে লোকজন এসে সহীহরূপে গ্রহণ করবে ক্বোরআনে কারীমের তেলাওয়াতের প্রশিক্ষণ। শুরু হল প্রচেষ্টার পর প্রচেষ্টা। সময় যতই দ্রুত চলতে লাগল, নিরাশার গহীন আঁধার দূরীভূত হয়ে ফুটে উঠতে লাগল আশার আলোক রেখা। পানিগাঁও নিবাসী হাজী আবু তাহির ছাহেব এ বিষয়ে হযরত ছিরামপুরী ছাহেবের পার্শ্বে ছিলেন সর্বক্ষণ। তিনিই প্রথমে বর্তমান সিলেট জেলার দক্ষিণ সুরমা থানাধীন রাখালগঞ্জে একটি সাধারণ সভা আহবান করলেন। মূলতঃ এই এলাকার লোকজনের সাথে এ ব্যাপারে তিনি আগেই আলাপ-আলোচনা করে রেখেছিলেন। এই সাধারণ সভায় হযরত ছিরামপুরী ছাহেব (রহঃ) কে আমন্ত্রণ জানানো হলো। এলাকার অনেক লোক ছিল হিন্দু। তাদের কর্ণেও হযরত ছিরামপুরী ছাহেবের সুমিষ্ট ও বলিষ্ঠ স্বরের সুখ্যাতি পৌছে ছিল। কৌতুহল দমাতে না পেরে তারাও এসে উপস্থিত হলো। এক পর্যায়ে শুরু হলো ক্বোরআন তেলাওয়াতের আসর। কন্ঠের

বলিষ্ঠতায় রোমাঞ্চে থর থর কেঁপে উঠল যেন প্রকৃতি। মধুমাখা কণ্ঠে বেজে উঠল সুর লহরী। আশ পাশ যেন হয়ে উঠল মৌ মৌ। সমবেত শ্রুতামন্ডলী চুপচাপ, পিনপিন নীরবতা। এমন সুর কি মানুষের হয়! ক্বোরআনের যাদুর পরশ শ্রোতাদের মনের জমিতে নিয়ে আসল উর্বরতা। হিন্দুরা মুগ্ধ নেত্রে তাকিয়ে থাকল দীর্ঘদেহী বাবরীকেশী কালো শশ্রুমন্ডিত এই সুদর্শন মানুষটির দিকে। চরম আবেগে ভরে উঠল তাদের মন। এক সময় তেলাওয়াত শেষ হলো। হিন্দুরা খুঁজে পেল তাদের নিজেদেরকে। বুঝতে পারল তাদের নয়নযুগল অশ্রুসিক্ত, যা হয়ত ঘটেছিল তাদের নিজেদেরই অজান্তে।

মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার ইতিহাস

৩০শে কার্তিক ১৩৫৫ বাংলা মোতাবেক ১৯শে অক্টোবর ১৯৪৮ ইংরেজী তারিখে রাখালগঞ্জ বাজার তথা এলাকায় অসামাজিক কার্যকলাপ প্রতিরোধের নিমিত্তে হিন্দু-মুসলিম জনতার এক জরুরী সাধারণ সভা দৌলতপুর নিবাসী মরহুম ক্বারী আম্বর আলী সাহেবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় অনেক আলাপ-আলোচনার পর পানিগাঁও নিবাসী জনাব আলহাজ্ব আবু তাহির সাহেব প্রস্তাব করেন যে, এখানে একটি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠলে সকল প্রকার কু-সংস্কার ও অসামাজিক কার্যক্রম চিরদিনের জন্য মূলোৎপাটিত হয়ে যাবে। অতঃপর উক্ত সভায় জনাব আলহাজ্ব ক্বারী ছিরামপুরী ছাহেব (রহঃ) এর সমধুর তিলাওয়াত শুনে আবেগ আপ্লুত হয়ে রাখালগঞ্জ বাজারের সম্পদ মূল মালিকগণ ফী ছাবীলিল্লাহ ওয়াক্বফ ও দান করে যান। পরবর্তী সভায় সিদ্ধান্ত হয় যে, উক্ত মাদ্রাসার ব্যয় নির্বাহার্থে রাখালগঞ্জ বাজারের প্রত্যেক দোকানদারের কাছ থেকে প্রতি হাটবারে অন্ততঃ ছয় পয়সা করে টোল আদায় করা হোক।

প্রতিষ্ঠাতা প্রধান শিক্ষক হিসেবে হযরত ছিরামপুরী ছাহেব (রহঃ) মাদ্রাসাটি যথারীতি আরম্ভ করেন এবং তাঁকে উক্ত মাদ্রাসার ওয়াক্বফ সম্পত্তির মুতাওয়াল্লী মনোনীত করা হয়। দাউদপুর নিবাসী খাঁন-বাহাদুর গৌছ উদ্দীন আহমদ চৌধুরী সাহেবের নামানুসারে কে, বি, গৌছ উদ্দীন আহমদ চৌধুরী গং ওয়াক্বফ এষ্টেট নাম রাখা হয়, যা তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান সরকার কর্তৃক যথা নিবন্ধিত হয়, যার ই, সি নং ১৩২৩৯। এর আয় দ্বারা প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে উক্ত মাদ্রাসা পরিচালিত হয়ে আসছে।

প্রথম ম্যানেজিং কমিটি

উল্লেখ্য যে, ১৩৫৮ হিজরী ১লা মুহাররাম তারিখের প্রস্তাব অনুযায়ী নিম্নলিখিত ভদ্র মহোদয়গণকে নিয়ে মাদ্রাসার প্রথম ম্যানেজিং কমিটি গঠন করা হয়:

মৌলভী কাছিম আলী চৌধুরী, লক্ষীপাশা, সভাপতি।
হযরত মাওলানা হাবিবুর রহমান (সূফী সাহেব) দৌলতপুর, সাধারণ সম্পাদক।
মোঃ রিয়াজ উদ্দীন ঘাসিবর্ণী, নিরীক্ষক।
হাজী আবু তাহির, পানি গাঁও, সদস্য
হযরত মাওলানা আক্বদ্দছ আলী, দৌলতপুর , সদস্য।
জনাব মাহমুদ আলী লক্ষণাবন্দ, সদস্য।
জনাব ক্বারী আফতাব উদ্দীন, ফুলসাইন্দ, সদস্য।
জনাব আনফর আলী, সিকন্দরপুর, সদস্য।
জনাব আব্দুস সামাদ, পানিগাঁও, সদস্য।

জনাব সাজ্জাদ আলী (তোতা মিয়া) নিমাদল, সদস্য।
জনাব মজির উদ্দীন (চাঁন মিয়া) লক্ষণাবন্দ, সদস্য।
জনাব মুবাশ্বির আলী, মির্জা নগর, সদস্য।
জনাব নজির আলী,মির্জানগর, সদস্য।
জনাব রইছ আলী, মির্জানগর, সদস্য।
জনাব ডাঃ ফজলুল হক্, নিমাদল ,সদস্য।
জনাব আছদ্দর আলী, সুঁড়িগাঁও, সদস্য।
জনাব হাফিজ আকৃদ্দছ আলী, লক্ষীপাশা, সদস্য।
জনাব ক্বারী মাওঃ আব্দুর রক্বীব ছিরামপুরী ছাহেব মুহতামীম/ প্রধান শিক্ষক।

মাদ্রাসার অবস্থান

ইসলামী বিপ্লবের এক সফল নায়ক হযরত শাহ্ জালাল (রহঃ) ও তাঁর ৩৬০ আউলিয়ার স্মৃতি বিজড়িত আধ্যাত্মিক রাজধানী সিলেট জেলার দক্ষিণ সুরমা থানার ১৭ নং দাউদপুর ইউনিয়ন পরিষদের অন্তর্গত সুজলা সুফলা শস্য-শ্যমলা, পাখপাখালীর কলরবে মুখর, ছায়াঘেরা অনাবীল প্রশান্তির মাতুলালয় সুপ্রসিদ্ধ দৌলতপুর গ্রামে ডি, এম রোডের পার্শ্বে রাখালগঞ্জ বাজারের মসজিদ সংলগ্ন স্থানে সিলেট শহর থেকে প্রায় ১৫ কিলোমিটার দূরে নিরিবিলি পরিবেশে অনন্য ঐতিহ্যবাহী এ অতি প্রাচীন ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত হয়।

প্রকাশ থাকে যে, জনাব ছিরামপুরী ছাহেব ক্বিবলাহ (রহঃ) ও হযরত মাওলানা আব্দুর রহমান বর্ণী ছাহেব (রহঃ) দীর্ঘদিন যাবৎ উক্ত মাদ্রাসার হেফাজতের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। পরবর্তী ষাটের দশকে রাখালগঞ্জ বাজার সংলগ্ন মসজিদ থেকে বর্তমান স্থানে মাদ্রাসা স্থানান্তর নিয়ে মতানক্য দেখা দিলে হযরত ফুলতলী ছাহেব ক্বিবলাহর হস্তক্ষেপে এ বিষয়টির সুরাহা হয় এবং প্রায় ৩৫ জন ব্যক্তির দানকৃত ভূমিতে বর্তমান স্থানে মাদ্রাসাটি স্থানান্তরিত হয়।

ছিরামপুর মাদ্রাসা ও হযরত ছিরামপুরী (রঃ)

১৯৫৪ সালে ছিরামপুর মাদ্রাসাটি প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। মাদ্রাসাটি প্রতিষ্ঠায় হযরত ছিরামপুরী (রহঃ) অনেক অবদান রেখেছিলেন। শুধু তাই নয়, ঐ এলাকার লোকজনের অনুরোধে তিনি প্রতি বৃহস্পতিবার ক্বোরআনুল কারীমের তেলাওয়াতের শিক্ষা দান করতেন। উল্লেখ্য যে, তিনি তখন তাঁর নিজ প্রতিষ্ঠান রাখালগঞ্জ মাদ্রাসার মুহতামিম ছিলেন। ছিরামপুর মাদ্রাসায় তাঁর থেকে কোরআনুল করীমের তেলাওয়াতের শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন যাঁরা, তাঁদের মধ্যে অত্র মাদ্রাসার বর্তমান মুহতামিম হযরত মাওলানা ক্বারী লোকমান আহমদ সাহেব, তয়বকামালের হযরত মাওলানা ক্বারী ইসহাক আহমদ সাহেব, পালপুর গ্রামের ডাঃ মোঃ নজরুল ইসলাম সাহেব, যিনি বর্তমানে একজন রেজিষ্টার্ড হোমিও চিকিৎসক হিসেবে সমধিক পরিচিত। তাঁর ওয়ালিদ মুহতারাম হযরত মাওলানা আব্দুস সুবহান সাহেব ঐ সময় অত্র মাদ্রাসার শিক্ষক ছিলেন। হযরত ছিরামপুরী (রহঃ) এর ঐ সকল ছাত্রদের কাছ থেকে জানা যায় যে, ক্বোরআন শরীফের একজন অতি উচ্চ পর্যায়ের ক্বারী ও ক্বোরআন শরীফের একজন একনিষ্ঠ খাদেম হিসেবে ছাত্র-শিক্ষক নির্বিশেষে সবার

কাছে তিনি অত্যন্ত প্রিয় ও শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। বিশেষ করে তাঁর চারিত্রিক মাধুর্য, তাক্বওয়া পরোপকার, সদাচার ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যের কথা তাঁরা আজও শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করেন।

কথায় ছিল যাদু:

নবী করীম (সাঃ) বলেছেন:. ان من البيان لسحرا অর্থাৎ "নিশ্চয়ই কথার মধ্যে যাদু আছে"। সত্যিই মানুষের মধ্যে এমন মানুষও আছে, যারা কথা বলে শ্রোতাকে মোহগ্রস্থ করে ফেলে। খাওয়া দাওয়া ইত্যাদি ফেলে রেখে মানুষ বিভোর হয়ে শুনতেই থাকে সেই যাদুময়ী বচন। হযরত ছিরামপুরী (রহঃ) ছিলেন এমনি এক কথার যাদুকর। কথার উত্থান পতনে, শব্দ চয়নে, উৎফুল্লতা ও গাম্ভীর্য প্রদর্শনে এক সুদক্ষ নিপুন কারিগর ছিলেন তিনি। তাঁর স্মৃতিশক্তি ছিল অত্যন্ত প্রখর। একবার যা শুনতেন জীবনে তা ভুলতেন না। অকপটে বলে যেতে পারতেন অনেকদিন আগে ঘটে যাওয়া অবিকল কাহিনী বা শুনা কথা। তাঁর প্রতিটি আলাপচারিতায় ছিল জ্ঞান আর সদুপদেশের ছড়াছড়ি। এত গল্প তিনি বলতেন, কিন্তু একটি গল্পও তাঁর অনর্থক ছিল না। বেশীরভাগই ছিল কোরআন হাদীসে বর্ণিত বিভিন্ন ঘটনাবলী। এ ছাড়াও তাঁর বক্তব্যে থাকত আওলিয়াদের বিভিন্ন আশ্চর্যজনক কাহিনী। প্রতিটি কাহিনীই ছিল জীবন গঠনের ক্ষেত্রে অত্যন্ত উপকারী। তিনি মানুষকে কেমন করে যাদুময়ী গল্পের বাঁধনে আটকে রাখতেন নিম্নে তার দু' একটি ঘটনা বর্ণনা করছি:

(১) সৎপুর মাদ্রাসায় গমন:

হযরত ছিরামপুরী সাহেবের বড় সাহেবযাদা মাওলানা শামসুল হুদা সাহেব একটি ঘটনা বর্ণনা করেন যে, আমি তখন সৎপুর মাদ্রাসায় অধ্যয়নরত ছিলাম। তখন মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা মুহতামীম ছিলেন হযরত মাওলানা গোলাম হুসেইন সাহেব। একাধারে তিনি যেমন ছিলেন বাহরুল উলূম, তেমনি ছিলেন একজন আশিকে রাসূল। তাঁর জীবদ্দশায় তিনি মাদ্রাসা থেকে কোন বেতন নেননি। তখন ঐ মাদ্রাসার মুহাদ্দিছ ছিলেন হযরত মাওলানা আব্দুল জব্বার সাহেব গোটারগ্রামী। এই দুই মহান ব্যক্তি আমার ওয়ালিদ মুহতারাম সম্পর্কে অনেক কথা শুনেছিলেন। তাঁদের আকাঙ্খা ছিল তাঁর সাথে মুলাকাত করার এবং তাঁর কথা শুনার। একদিন আমার ওয়ালিদ মুহতারাম আমাকে দেখার জন্য সৎপুর মাদ্রাসায় তাশরীফ নিলেন। খবর পেয়ে মুহতামীম সাহেব ও মুহাদ্দিস সাহেব খুবই আনন্দিত হলেন। মুহতামিম সাহেব আমার ওয়ালিদ মুহতারামকে তাঁর রুমে নিয়ে গেলেন। মুহাদ্দিস সাহেবও ঐ রুমে এসে উপস্থিত হলেন। সময় ছিল যোহরের নামাযের কিছুক্ষণ পর। তাঁদের সাথে যাওয়ার সময় আমার সাথে একবার দেখা হয়েছিল। তারপর আমি ছাত্রাবাসে চলে গেলাম। তাঁর সাথে আর আমার সাক্ষাৎ হয়নি। আছরের নামাযের সময় হল, দেখলাম হযরত মুহতামিম সাহেব ও মুহাদ্দিস সাহেব তাঁকে ঘিরে নিয়ে এসে আছরের নামায আদায় করেই আবার তাঁকে ঘিরে নিয়ে মুহতামিম সাহেবের রুমে প্রবেশ করলেন। মাগরিবের নামাযের সময়ও ঠিক একই অবস্থা অবলোকন করলাম। এশার নামাযের সময় হল। এবারও ঠিক পূর্বের অবস্থা। নামায আদায় করেই আবার সেই রুমে প্রবেশ করলেন। আমি তখন মনে মনে ভাবলাম, আল্লাহই ভাল জানেন, এত দীর্ঘ সময় ধরে তাঁরা কি করছেন। রাতে খাবার খেয়ে আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। পরের দিন ফজরের নামাযের পর ওয়ালিদ মুহতারামের সাথে আমার

দেখা হল। তিনি নামায আদায় করে বিদায় নিয়ে চলে আসলেন। পরে মুহতামিম সাহেব ও গোটার গ্রামের মুহাদ্দিছ সাহেবের কাছ থেকে জানতে পারলাম যে, ঐ দিন হযরত মুহতামিম সাহেবের রুমে ওয়ালিদ মুহতারাম তাঁদের সাথে তাঁদের ফরমায়েশমত বিভিন্ন বিষয়ে কথা বলেছিলেন। তাঁর কথার মাধুর্য এতই যাদুময়ী ছিল যে, বার বার তাঁর কথা শুনতে ইচ্ছে হচ্ছিল। আর তাই তো যোহরের কিছুক্ষণ পর থেকে রাত আড়াইটা পর্যন্ত নাস্তা, আহারপর্ব ও নামায ছাড়া বাকী সময় তিনি শুধু কথা বলে যাচ্ছিলেন অনবরত এবং মুহতামীম সাহেব ও মুহাদ্দিছ সাহেব তন্ময় হয়ে শুনেই যাচ্ছিলেন। রাত আড়াইটা যখন বাজে তখন ওয়ালিদ সাহেব নিজ থেকেই তাঁদেরকে বলেছিলেন যে, আমি আজ সুনামগঞ্জ থেকে হেঁটে আপনাদের এখানে এসেছি, তাছাড়া ফজরের নামাযও তো আদায় করতে হবে। তাই কিছুটা সময় হলেও বিশ্রাম নেয়াটা বোধ হয় ভাল হবে। এই বলেই তবে তিনি তাঁদের কবল থেকে ছুটে এসেছিলেন। পরে হযরত মুহাদ্দিছ সাহেব আমাকে বলেছিলেন, তোমার ওয়ালিদ সাহেবের কথায় যাদু আছে। আমরাও তো কম বেশী কথা বলতে পারি; কিন্তু তিনি আমাদের মনে এমন অবস্থা সৃষ্টি করেছিলেন যে, আমরা যেন কথা বলতে ভুলেই গিয়েছিলাম।

(২) হযরত ছিরামপুরী সাহেবের বড় ছেলে আরেকটি ঘটনা বর্ণনা করেন, যা তাঁর নিজের সাথে সম্পর্কিত। ঘটনাটি এই:

দিনটি ছিল শুক্রবার। আমার ওয়ালিদ সাহেব তখন প্যারালাইসিস রোগে আক্রান্ত। কথা আগের মত বলতে পারতেন না। আমি প্রায়ই তাঁর মাথার চুল, নখ ও গোঁফ কেটে দিতাম। তিনি আমার জন্য অপেক্ষা করতেন, কখন বাড়ি আসব এবং এগুলো ছোট করে দেব। ঐদিন এমনি তাঁর গোঁফ ছোট করে দিচ্ছিলাম; হঠাৎ তিনি আমাকে বললেন, শামসুল হুদা! উবায়দুল্লাহ আহবার (রহঃ) এর ঘটনা কি তুমি জান? আমি জবাব দিলাম, জ্বি না, জানিনা। আমার জবাব শুনে তিনি যেন একটু অবাকই হলেন। পরে তিনি নিজেই ঘটনাটি বলা শুরু করলেন। ঘটনাটি ছিল এই:

হযরত উবায়দুল্লাহ আহবার (রহঃ) ভারতবর্ষের অধিবাসী অত্যন্ত পরহেজগার একজন বুযুর্গ ছিলেন। তাঁর ছিল হাজার হাজার মুরীদান। বিশাল সম্পদের অধিকারী ছিলেন তিনি। সম্পদের প্রতিযোগিতায় রাজা বাদশারাও যেন হার মানবে। তাঁর এ বিশাল সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কর্মচারীও ছিল হাজারে হাজার। এমন সুবিশাল স্টেটের মালিক হয়েও তিনি ছিলেন নির্বিকার। সম্পদের মোহ তাঁকে সামান্যতমও স্পর্শ করতে পারেনি। তিনি চলতেন আগে আগে, সম্পদ চলত পেছনে পেছনে। তবুও পেছনে তাকাবার নাম নেই তাঁর। সে সময় শাম দেশের একজন পরহেজগার বুযুর্গ লোক ভারতবর্ষের হযরত উবায়দুল্লাহ আহবার (রহঃ) এর অসামান্য বুযুর্গীর কথা শুনলেন। শুনামাত্র তাঁর সাথে মুলাকাতের অদম্য আকাঙ্খা তাঁর মনে জেগে উঠল। সুতরাং তিনি ভারতবর্ষে সফরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে গেলেন। তখন কিন্তু আজকালের মত যানবাহনের সুব্যবস্থা ছিল না। পদব্রজেই বেশীরভাগ সফর করতে হত। অবশেষে তিনি ভারতবর্ষে এসে পৌছলেন। তিনি তাঁকে জীবনে কখনও দেখেননি। তাই লোকজনকে জিজ্ঞেস করে অবশেষে হযরত উবায়দুল্লাহ আহবার (রহঃ) এর সুবিশাল অট্টালিকার সামনে এসে উপস্থিত হলেন। লোকজনকে জিজ্ঞেস করলেন, এটাই কি

উবায়দুল্লাহ আহবারের বাড়ি? লোকজন উত্তর দিল, হ্যাঁ, এটাই তাঁর বাড়ি। আগন্তুক তাজ্জুব হয়ে গেলেন। ধীরে ধীরে তাঁর তাজ্জুব তাআসসুফে (দুঃখে) পরিণত হল। চেহারায় বেদনার আভা ফুটে উঠল। মনে মনে বললেন, হায়, এ কী করলাম? এত দূরের পথ পেরিয়ে অবশেষে এমন এক লোকের সাথে সাক্ষাৎ করতে এলাম, যে কি না একজন দুনিয়ালোভী। এত সম্পদ, এত বড় অট্টালিকা যার, সে কী করে একজন আল্লাহওয়ালা মুত্তাকী হতে পারে? আফসোস যেন তাঁর আর শেষই হয় না। এখন আর কি করা। মাগরীবের সময় হয়ে গেল। আগন্তুক পাশের একটি মসজিদে মাগরিবের নামায আদায় করলেন। অতঃপর তিনি মুরাকাবায় নিমগ্ন হয়ে গেলেন। এশার আযান হল। তিনি নামায আদায় করলেন। এবার মসজিদের মুয়াজ্জিন বললেন, জনাব! আমি এখন মসজিদ তালাবদ্ধ করব। অনুগ্রহপূর্বক বেরিয়ে গেলে ভাল হয়। আগন্তুক বললেন, দেখুন ভাই, আমি সুদূর শামদেশ থেকে আপনাদের দেশে এসেছি। এদেশে আমার কোন পরিচিত লোক নেই। অনুগ্রহ করে অনুমতি প্রদান করলে আমি মসজিদেই অদ্যকার রাতটি যাপন করব। মুয়াজ্জিন সাহেব অবশেষে এক মুসাফিরের আবেদন মেনে নিলেন এবং মসজিদে অবস্থানের অনুমতি দিয়ে দিলেন। আগন্তুক রাতে মসজিদে এবাদতে মশগুল রইলেন। এক সময় রজনী গভীর থেকে গভীর হল। তিনি কিয়ামুল লাইল আদায় করলেন। এমন সময় কে যেন মসজিদের দরজায় করাঘাত করে উঠল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "কে? কে আপনি? কোথা থেকে এসেছেন"?

সদ্য আগত লোকটি বললেন, আমি এক মুসাফির। অনুগ্রহপূর্বক দরজা খুলুন"।

"না, দরজা খোলা যাবে না। এমনিতেই মসজিদের দরজা বন্ধ থাকে। আমি বহু দূরের মুসাফির বলে মুয়াজ্জিন সাহেব আমাকে অনুমতি দিয়েছেন। আপনি অন্য কোথাও যান"। শামদেশীয় আগন্তুক বললেন।

"জনাব, আমার উপর একটু অনুগ্রহ করুন"। দরজার বাইরে দাঁড়ানো লোকটি বলে উঠলেন। কি করা যায়, অবশেষে তিনি দরজা খুললেন। লোকটি প্রবেশ করলেন। শুরু হল সংলাপ:

"আপনি কে"? সদ্য আগত লোকটি প্রশ্ন করলেন।

"আমি এক মুসাফির"।

"কোথা থেকে এসেছেন"?

"শাম থেকে"। মসজিদে অবস্থানকারী আগন্তুক বললেন।

"কী উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষে আপনার আগমন"?

সে কথা বলে আর মনের দুঃখ বাড়াবেন না ভাই"।

"তারপরেও একটু বলুন"। অনুরোধ ঝরে পড়ল সদ্য আগত মুসাফিরের কণ্ঠ থেকে।

"ভাই! এসেছিলাম আপনাদের দেশের উবায়দুল্লাহ আহবারের সাথে মুলাকাতের উদ্দেশ্যে। লোক মুখে শুনেছিলাম যে, তিনি অত্যন্ত পরহেজগার আল্লাহওয়ালা বুযুর্গ লোক। কিন্তু আমি কল্পনাও করতে পারিনি যে, এমন এক সুমহান ব্যক্তির এত বিশাল সম্পদ থাকতে পারে। এখন আমার কেমন জানি মনে হচ্ছে যে, তিনি সম্পদলোভী এক দুনিয়াদার বৈ আর কিছু নন। বড় আফসোস হচ্ছে, কেন এত পরিশ্রম করে লোকটির সাথে সাক্ষাৎ করতে এলাম"?

"তাঁর সাথে কি আপনি সাক্ষাৎ করবেন না"?
"কী যে বলেন ভাই? এক দুনিয়ালোভী মানুষকে দেখার জন্য তো আমি এখানে আসিনি। আপনি আর আমার জ্বালা বাড়াবেন না। এমনিতেই আমি দুশ্চিন্তায় আছি"।
"তাহলে আপনি কী চলে যাবেন"?
"জ্বি হ্যাঁ, আগামীকাল ভোরে আল্লাহ চাহে তো রওয়ানা দেব"।
"আপনি কী দেশে ফিরে যাবেন"?
"জ্বি না। প্রথমে মক্কা শরীফ ও পরে মদীনা শরীফ যেয়ারত করে তবে নিজ দেশ শামদেশে চলে যাব, ইচ্ছে করেছি"।
"জনাব, যদি অনুমতি দেন তবে আমি আপনার সাথে মক্কা-মদীনা সফরে সঙ্গী হতে চাই"।
"তা হতে পারে না। আপনি যেতে চান তবে যান। আমার সঙ্গী হয়ে নয়। আমি একাই যেতে চাই। একা থাকতেই আমি পছন্দ করি"।
"দেখুন জনাব! আপনি বহুদূর থেকে আগত একজন ক্লান্ত-শ্রান্ত মুসাফির। আপনার চেহারা দর্শনে মনে হচ্ছে, আপনার বিশ্রামের প্রয়োজন, প্রয়োজন খেদমতের। আমি যদি আপনার সাথী হবার অনুমতি পাই তবে আমি আপনার সেবা-শুশ্রূষা করব। এতে আপনার সফর একটু হলেও সহজ হবে বলে আশা রাখি। শামদেশীয় মুসাফির ভাবনায় পড়ে গেলেন, সত্যিই তো আমি এখন অত্যন্ত পরিশ্রান্ত এক পথিক। শরীর আমার বিশ্রাম চায়। তাই তো লোকটি যদি আমার খাদেম হয়ে যায় তবে ভালই হবে। অনেক ভেবে চিন্তে বললেন, আচ্ছা তাই হবে। আগামীকাল ফজরের নামাযের পরপরই আমরা সফর শুরু করব।
"জ্বী জনাব, তাই হবে"।

কিয়ামুল লাইলের তখনও সময় বাকী আছে। তাই উভয়ে ওযূ করে এসে নফল নামায পড়লেন। নামায আদায় করার পর হঠাৎ ভারতীয় আগন্তুক বললেন, হুজুর! গোস্তাখী মাফ করবেন, আপনার পবিত্র জবান থেকে মক্কা ও মদীনা শরীফের নাম শুনে নিজেকে আর ধরে রাখতে পারছি না। আমার কেমন জানি মনে হচ্ছে, যত দ্রুত সম্ভব, এমনকি এখনই সফর শুরু করলে খুবই ভাল হয়। চিন্তা করবেন না জনাব, আপনার আসবাব পত্র আমার কাঁধেই উঠিয়ে নেব। আপনার কোন তাকলীফ হবে না। এখন শুধু আপনার অনুমতির প্রয়োজন। শামদেশী মুসাফির একটু লজ্জিত হলেন। ভাবলেন, আশিকে রাসূল বটে। আমার মধ্যে তো এ রকম আগ্রহ জন্মেনি। বললেন, ঠিক আছে, চলুন।

টুকি টাকি যা কিছু ছিল সবকিছু গুছিয়ে 'আল্লাহ ভরসা' বলে সফর শুরু করলেন দুই মুসাফির। ভারতীয় মুসাফির শামদেশী মুসাফিরের আসবাবপত্র নিজ কাঁধে উঠিয়ে নিলেন। শামদেশী মুসাফির চললেন আগে আগে আর ভারতীয় মুসাফির কাঁধে বোঝা নিয়ে চললেন পেছনে পেছনে। নিবেদিত প্রাণ এক খাদেম বটে! এক প্রাণবন্ত সফর। পথিকদ্বয় পা ফেলছেন একমনে। হঠাৎ থমকে দাঁড়ালেন শামদেশী মুসাফির।
ঃ 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন' বলে উঠলেন শামদেশী মুসাফির।
ঃ জনাব কী হয়েছে? অবাক কণ্ঠে বলে উঠলেন বোঝা বহনকারী মুসাফির।
ঃ ভাই! ভুলে আমার লোটা মসজিদে ফেলে এসেছি। এখন এটা নিয়ে আসতে হবে।
ঃ জনাব! এটা তো এক সাধারণ বস্তু। এটার জন্য চিন্তা করার কোন প্রয়োজন নেই। আরেকটা না হয় কিনে ফেলব। আমরা অনেক পথ পেরিয়ে এসেছি। এখন আর ফিরে গিয়ে

কাজ নেই।
ঃ কী বললেন আপনি! দৈনন্দিন কাজে লোটা নিত্য প্রয়োজনীয় একটি জিনিষ। আর আপনি বলছেন এটা সেখানেই পড়ে থাকতে। নেয়ামতের কদর করতে হয় তা কি আপনি জানেন না?
ঃ জনাব এই যদি হয় আপনার কথা, তবে তো আপনি আমাকে অবাকই করবেন। সাধারণ এক লোটার মোহ আপনাকে ব্যস্ত ও বেকারার করে তুলেছে, ফিরে নিয়ে আসার জন্য বারবার তাগিদ দিচ্ছে। আর আপনিও এতে প্রভাবিত হয়ে যাচ্ছেন। এখন বলুন তো জনাব, আমার এত সুবিশাল সহায়-সম্পদ অরক্ষিত রেখে আপনার সফর সঙ্গী হয়ে চললাম! কৈ আমার তো একবারও এই বিশাল সম্পদের কথা মনে আসেনি। আমি আমার এই বিরাট স্টেট হাজার হাজার লোকের তত্ত্বাবধানে রেখে তাদেরকে কিছু না জানিয়ে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনকে এর জিম্মাদার বানিয়ে আপনার সাথী হয়েছি।

শামদেশী মুসাফিরের দু'চোখ নত হয়ে আসল। বললেন, সত্যি করে বলুন আপনি কে?
ঃ আমি উবায়দুল্লাহ আহবার, যাকে আপনি নিছক একজন সম্পদ-লোভী দুনিয়াদার হিসেবেই জেনেছেন এবং নেহায়েত ঘৃণার চোখে দেখেছেন। শামদেশী মুসাফির আর নিজেকে ধরে রাখতে পারলেন না। দু'চোখ ছাপিয়ে আসল নোনাজল। তীব্র অনুশোচনার সুর বেজে উঠল হৃদয়ের গহীনে। বোঝা বহনকারী মুসাফিরের পায়ের কাছে তিনি লুটিয়ে পড়লেন।
ঃ আল্লাহর ওয়াস্তে এই নাদানকে ক্ষমা করে দিন। আমি না বুঝে আপনার মত এমন মহান ব্যক্তিকে ঘৃণার চোখে দেখেছি। ছিঃ, ধিক নিজেকে।
ঃ আপনার উপর আমার কোন দুঃখ নেই। আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন। আমীন।
ঃ এখন না হয় আমার ঘরে ফিরে চলুন?
ঃ ঠিক আছে, জনাব।

দু'জন আবার ফিরে চললেন। এবার ভিন্ন এক পরিবেশ। নতুন মনের দু'জন মানুষ। এবার শামদেশী মুসাফির হলেন বোঝা বহনকারী। উবায়দুল্লাহ আহবার চললেন আগে আগে। আর বোঝা বহনকারী চললেন পেছনে পেছনে। ঘটনাটি এই পর্যন্তই। এমন সময় আম্মাজান এসে আমাকে বললেন, একটার উপরে বাজে, তুমি কি নামাযে যাবে না? ওয়ালিদ মুহতারামকে বললেন, এ কি করছেন? ছেলেকে ছাড়ছেন না কেন? নামাযের সময় যে পেরিয়ে যাচ্ছে। তিনি হেসে বললেন, আমার তো জুমার নামায নেই। তোমার ছেলে যাচ্ছে না কেন? তখন আমারও চেতনা ফিরে এল। সত্যিই তো নামাযের সময় অতিক্রান্ত হওয়ার উপক্রম। এদিকে আমি বাড়িতে থাকলে গ্রামের মসজিদে আমাকেই নামাযের ইমামতের দায়িত্ব পালন করতে হত। মুসল্লীগণ ইন্তেজার করছেন, আর আমি বেখবর বসে আছি। তখন তড়িঘড়ি করে মসজিদে উপস্থিত হয়ে দেখলাম সত্যিই মুসল্লী সম্প্রদায় আমার জন্য অপেক্ষমান।

ছাহেব কিবলার জীবনের কতিপয় ঘটনাবলী

আজ অনেক দিন হল, হযরত ছিরামপুরী ছাহেব (রহঃ) এর ইন্তেকাল হয়েছে। বলতে গেলে এক যুগ পর তাঁর জীবনী লিখতে গিয়ে বড়ই আফসোসের সাথে বলতে হচ্ছে যে, হযরত ছাহেব ক্বিবলাহর জীবনী লিখতে খুব বেশী বিলম্ব হওয়ায় তাঁর জীবনে ঘটে যাওয়া

অনেক আশ্চর্য কাহিনী সংগ্রহ করা কঠিন হয়ে পড়েছে। কারণ যে সকল ব্যক্তিবর্গের কাছে থেকে হযরত ছাহেব ক্বিবলাহ (রহঃ) সম্পর্কে অধিকতর জানার সমূহ সম্ভাবনা ছিল, তাঁদের প্রায় সবাই আজ এই দুনিয়ায় নেই। তারপরও সাধ্যমত সংগৃহীত গোটা কয়েক ঘটনাবলী সম্মানিত পাঠকবৃন্দের সামনে ব্যথাতুর হৃদয়ে তুলে ধরলাম।

পাসপোর্ট ছাড়াই আসাম গমন:

(ক) এখনকার মতই সে সময়ও আসাম যেতে হলে পাসপোর্টের প্রয়োজন হত। হযরত বদরপুরী (রঃ) এর নির্দেশ পেয়ে ছিরামপুরী (রঃ) আসামের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করলেন। হয়ত কোন অসুবিধের কারণে তিনি পাসপোর্ট করতে পারেননি । যখন তিনি চেকপোষ্টের কাছে আসলেন, অফিসার তাঁর কাছে পাসপোর্ট চাইল। কিন্তু তাঁর কাছে তো পাসপোর্ট নেই। বিরাট সমস্যায় পড়ে গেলেন। হঠাৎ তাঁর মনে বদরপুরী (রঃ) এর কথা উদয় হল। তিনি তাঁর প্রতি ধ্যানমগ্ন হলেন। এ অবস্থা দর্শনে অফিসারটি কি যেন ভাবল। অতঃপর তাঁকে চেকপোষ্ট পেরিয়ে সামনের দিকে চলে যেতে বলল। এভাবেই হযরত ছিরামপুরী (রঃ) বিনা বাঁধায় আসাম গমন করলেন।

(খ) ১৯৫৪ সালের ঘটনা। তখন হযরত বদরপুরী (রঃ) আসামে অবস্থান করছিলেন। হঠাৎ বুখারী শরীফের একটি নির্দিষ্ট সংস্করণের কপির তাঁর প্রয়োজন দেখা দিল। তিনি ছিরামপুরী (রঃ) এর কাছে সংবাদ প্রেরণ করলেন এই মর্মে যে, তিনি যেন সেই নির্দিষ্ট সংস্করণের কপিটি তাঁর কাছে পৌছে দেন। (সংস্করণের পরিচিতি জানা সম্ভব হয়নি)। সংবাদ পেয়ে হযরত ছিরামপুরী (রঃ) হাফিজ মুযাম্মিল আলী সাহেবকে সঙ্গে নিয়ে বুখারী শরীফের ঐ কপিটি সাথে করে আসামের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিলেন। এবারও তাঁদের কাছে পাসপোর্ট ছিল না। আল্লাহই ভাল জানেন, হয়ত ঐ সময় পাসপোর্ট সংগ্রহ করা কঠিন ছিল। যাক, এবারও আল্লাহর উপর ভরসা করে পাসপোর্ট অফিসারের সামনে তাঁরা গিয়ে দাঁড়ালেন। হযরত ছিরামপুরী (রঃ) এর বুকে চেপে ধরা ছিল বুখারী শরীফের সেই কপি। অফিসারটি সে দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'এইখানা কী'? তিনি উত্তরে বললেন, 'ইহা একখানা কিতাব'। অফিসারটি বলল, 'ইহা কি কালামুল্লাহ'? তিনি বললেন, হ্যাঁ। অফিসারটি বলল, ঠিক আছে। অতঃপর অফিসারটি কি যেন ভাবল। অবশেষে তাঁদেরকে বলল, আপনারা আপনাদের লক্ষ্যস্থলে চলে যান। আল্লাহর প্রতি অশেষ শুকরিয়া জ্ঞাপনপূর্বক আসামে বদরপুরী (রঃ) এর দরবারে উপস্থিত হলেন।

সুলতানুল আযকার

সুলতানুল আযকার আল্লাহর যিকিরের এক বিশেষ পদ্ধতি, যার মাধ্যমে একজন আবেদ অনেক্ষণ পর্যন্ত শ্বাস গ্রহণ না করে আল্লাহর ধ্যানে নিমগ্ন থাকতে পারেন। হযরত ছিরামপুরী সাহেব (রহঃ) এই পদ্ধতির যিকিরে অভ্যস্ত ছিলেন। আর এই বিশেষ পদ্ধতির যিকিরের বদৌলতে তিনি বিভিন্ন মুসিবত থেকে উদ্ধার লাভ করেছিলেন।

একদিনের ঘটনা

তিনি তখন ইমাম ছিলেন। এক বাড়িতে তাঁর থাকার স্থান ছিল। তিনি যে কক্ষে থাকতেন সে কক্ষে তাঁর বিছানার পাশে এক বিশাল ধানের মড় ছিল। একদিন রাতে তিনি বিছানায় ঘুমিয়ে আছেন, গভীর রাতে হঠাৎ করে সেই ধানের মড়টি ভেঙ্গে ধানসহ তাঁর উপর এসে পড়ল। আওয়াজ শুনে পার্শ্ববর্তী কক্ষের লোকজনের ঘুম ভেঙ্গে গেল। তারা উঠে

এসে ছিরামপুরী সাহেবকে ডাকলেন। কোন সাড়া শব্দ না পেয়ে অজানা আশংকায় তাদের বুক কেঁপে উঠল। ভিতর থেকে দরজা বন্ধ থাকায় রুমের দরজা খুলতে তাদের অনেক বিলম্ব হয়ে গেল। দরজা খুলে তারা দেখলেন, ছিরামপুরী হুজুরের বিছানার উপরে ধানের উঁচু স্তুপ। তড়িঘড়ি হাঁক ডাক শুরু হয়ে গেল। কেউ আত্মনিয়োগ করলেন ধান সরানোর কাজে, আবার কেউ নিজেকে নিয়োজিত করলেন ভেঙ্গে যাওয়া মড়টি সরাতে। কিন্তু ধান এত বেশী ছিল যে, অল্প সময়ে তা সরানো সম্ভব হচ্ছিল না। লোকজন ধান সরাচ্ছিলেন আর ভাবছিলেন যে, দুর্ঘটনার সময় থেকে প্রায় ঘন্টা দেড়েক সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পথে, ছিরামপুরী সাহেব হয়ত আর বেঁচে নেই। কোন মানুষের এত সময় এভাবে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। এক সময় ধান সরানোর কাজ শেষ হল। সবাই তাকিয়ে দেখলেন যে, ছিরামপুরী সাহেবের উভয় চোখ বন্ধ। সবার মনে বদ্ধমূল ধারণা হল যে, তিনি ইনতিকাল করেছেন। এমন সময় উপস্থিত লোকজনকে বিস্ময়ে হতবাক করে দিয়ে তিনি উঠে বসলেন। মৃদু হেসে বললেন, অবশেষে কাজটা শেষ করতে পেরেছেন। উপস্থিত লোকজনের বিস্ময়ের ঘোর যেন কাটছিল না। কী অবিশ্বাস্য ঘটনা, প্রায় আড়াই ঘন্টা পর্যন্ত শ্বাসরুদ্ধ অবস্থায় একজন মানুষ কী করে বেঁচে থাকতে পারে। উপস্থিত লোকজন ঘোর লাগা কণ্ঠে বলে উঠলেন, হযরত! আপনি কি বেঁচে আছেন? হযরত ছিরামপুরী (রহঃ) মুচকি হেসে বললেন, বেঁচে আছি বলেই তো আপনাদের সাথে কথা বলতে পারছি। ছিরামপুরী সাহেব অবধারিত মৃত্যুর হাত থেকে অলৌকিকভাবে বেঁচে গেছেন, এ সংবাদটি আলোর গতিতে এলাকাময় ছড়িয়ে পড়ল। লোকজন দলে দলে এসে ভীড় জমালেন দুর্ঘটনাস্থলে। সবার মনে একই কৌতুহল, একই প্রশ্ন, একই জিজ্ঞাসা, কেমন করে এত দীর্ঘক্ষণ তিনি শ্বাস গ্রহণ না করে বেঁচে রইলেন? হযরত ছিরামপুরী সাহেব (রহঃ) সবার সামনে উপস্থিত হলে তারা সমবেত স্বরে তাদের এই জিজ্ঞাসার কথা জানাল। তিনি তাদের কৌতুহলের অবসানকল্পে বললেন, আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের অপার কৃপায় আমি অকল্পনীয়ভাবে এই নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে ফিরে এসেছি। আর তা সম্ভব হয়েছে সুলতানুল আযকারের বদৌলতে। এটা যিকিরের এমন এক পদ্ধতি, যা যাকিরকে ধ্যানের জগতে নিয়ে এসে আবদ্ধ করে ফেলে। তখন শ্বাস গ্রহণ-বর্জনের উপর তাঁর আর নির্ভরতা থাকে না। এমনি করে যাকির দু' একদিন পর্যন্ত শ্বাস গ্রহণ না করেও বেঁচে থাকতে পারেন। আল্লাহর কৃপায় আমি এই বিশেষ প্রক্রিয়ার যিকিরের ক্ষেত্রে পূর্ব থেকেই অভ্যস্ত ছিলাম। যখন রাতের গভীরে ধানের বিশাল মড়টি আমার উপর এসে পড়ল, তখন আমি সুলতানুল আযকারের প্রতি মনোনিবেশ করলাম। আর এই যিকিরের বদৌলতেই আমি এতক্ষণ শ্বাস গ্রহণ না করেও বেঁচে থাকতে পেরেছি। লোকজন তখন তন্ময় হয়ে শুনছিলেন তাঁর অলৌকিক কাহিনী।

(১) <u>কদু চোরের দশা, পায়না পথের দিশা</u>

এই পৃথিবীতে পুচকে চোরদের নিয়ে হরেক রকম মুখরোচক কাহিনী আমরা শুনতে পাই। অধিকাংশ মানুষই এসব পুচকে চোরদের উৎপাতের খপ্পরে একবার না একবার পড়ে থাকেন। হয়ত এসব চোরেরা চোরাই মাল নিয়ে প্রায়ই ঘরে ফিরে চেহারায় ভুবন বিজয়ী হাসির মেকআপ মেখে স্ত্রী-বাচ্চাদের নিয়ে মহা উৎসব শুরু করে। কিন্তু কখনো কখনো আবার চুরি করতে এসে ধরা খেয়ে উচিৎ শিক্ষার ধোলাই খেয়ে 'জীবনে আর কখনো চুরি করব না' এমন বিড়ালের তওবাও করে। এমনই এক ঘটনা ঘটেছিল হযরত ছিরামপুরী (রঃ)

এর বাড়িতে। ঘটনাটি ছিল এরকম:

ছিরামপুরী সাহেবের আম্মাজান কদু তরকারী খুব ভালবাসতেন। তিনি খুব শখ করে কদু ক্ষেত করিয়েছিলেন। কদুর যখন ফলন আসল, তখন খাওয়ার উপযোগী হওয়া মাত্র একের পর এক করে কে যেন কদুগুলো নিয়ে যেতে লাগল। ছিরামপুরী সাহেব কিছুদিন পর বাড়ি আসলে উনার আম্মাজান এই অভিযোগ দায়ের করলেন। তিনি বিকেলে কদু ক্ষেতে গেলেন এবং চতুর্দিক একবার ঘুরে আসলেন। পুঁচকে চোর বাজার থেকে মাছ কিনল। তরকারী কেনার আর প্রয়োজন মনে করল না। অন্ধকার রাত্রি। চোর মনে মনে ভাবল, বাজারে আসার সময় দেখে এসেছি ক্বারী ছাহেবের তরকারী ক্ষেতে কী রিষ্ট পুষ্ট লাউ। ওরে রসনা আমার! দাঁড়াও যাদু। অধৈর্য হয়োনা। আজ রাতেই তোমার সাথে ক্বারী ছাহেবের রসময় লাউয়ের মোলাক্বাত করিয়ে দিয়েই তবে বুকে একখান থাপ্পড় মেরে দেখিয়ে দেব চোরজগতের নাম কেউ রাখলে... সে যে আমিই। চোর খুশী মনেই পা দু'খানি সামনে বাড়ালো, হয়ত বা এই কলিই সে আওড়াচ্ছিল;

আর যে দেরী সয় না * মন ধরেছে কদু চুরির বায়না।

তরকারী ক্ষেতে এসে ঢুকলো চোর চুপি চুপি। 'চুরি কর আর পালাও' এই পরিকল্পনাই হয়ত বেয়াদব এই চোরের মাথায় ঘুরছিল। যাক, চুরি শেষ। এবার তরকারী ক্ষেত থেকে বিদায় নেবার পালা। আরে, এ কি, সবই যে আঁধার! চোখ রগড়িয়েও... নাহ, এ আবার কী শুরু হলো? পথ কই? নেই...পথ নেই। হায়! এখন কী যে হবে? অসহায় চোর মশাইর এবার ফিরল মতি, মনের ভিতরে শব্দ করে উঠল...শপাং। বেরিয়ে যাবার কোন পথ নেই। পুঁচকে চোরের কপাল গেল কুঁকড়ে, মেজাজ গেল বিগড়ে। তো এখন আর কী করা? শুধু একটি কাজ, ঘোড়ার মত দৌড়ানো এবং কোন প্রকারে বেরিয়ে পড়ার চেষ্টা করা। শুরু হল দৌড় প্রতিযোগিতা। ফজর পর্যন্ত চলল এই দৌড়ের মহড়া। কিন্তু সব বিফলে গেল। সে আদৌ বেরিয়ে যাওয়ার রাস্তা পেল না। ফজরের ওয়াক্ত হলো। নামায আদায় করে হযরত ছিরামপুরী ক্বারী ছাহেব ক্ষেতের ধারে এসে দেখলেন একটা লোক দিশেহারা হয়ে এক হাতে মাছ আর আরেক হাতে তাঁর ক্ষেতের লাউ নিয়ে ক্ষেতের চারপার্শ্বে দৌড়াচ্ছে। তিনি এসে বললেন, কী ভাই! এখানে কী করছ? আওয়াজ শুনে দৌড়ে এসে চোরটি তাঁর পায়ের উপর উপুড় হয়ে পড়ে জড়িয়ে ধরে বলল, হযরত! আমাকে ক্ষমা করে দিন। জীবনে এমন খারাপ কাজ আর করব না। তিনি ঘটনাটি বুঝে ফেললেন। ক্ষমা করে দিলেন তাকে। ইতিহাসের দোহাই দিয়ে এক ওয়াইজ বলেছিলেন, হযরত মুসা (আঃ) এর লাঠির মুজেযা দেখে ফেরাউন ভয়ে একশত চারবার পায়খানা করেছিল, আল্লাহই ভাল জানেন, ঐ পুঁচকে চোরটি ভয়ে তখন কী করেছিল......?

(২) মাওলা হয়ে যান যার, সবকিছু হয়ে যায় তার

যে ব্যক্তি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার প্রিয় পাত্র হয়ে যান আল্লাহ তায়ালা নিজেই তার সকল কিছুর জিম্মাদার হয়ে যান। একবার কয়েকদিন যাবৎ ক্বারী ছাহেব ক্বিবলাহ (রহ:) এর ঘর নির্জন অবস্থায় ছিল। একদিন উনার কাছে খবর এল যে, আপনার ঘরে চোর সিধ কেটেছে। হযরত ছিরামপুরী ছাহেব ক্বিবলাহ (রহঃ) বাড়ি গিয়ে দেখলেন যে, চোর ঘরে ঢুকার জন্য সাতটি সিধ কেটেছে। যখন তিনি ঘরে প্রবেশ করে সবকিছু বহাল দেখলেন, তখন নিশ্চিত হলেন যে চোরটি তাহলে অবশেষে ঘরে ঢুকতে পারেনি। হযরত ছিরামপুরী

(রহ:) আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলেন। সম্মানিত পাঠক! একটি ঘরে চোর প্রবেশ করার জন্য একটি সিধ কাটলেই চলে সেখানে নাছোড়বান্দা এই চোরটি সাত সাতটি সিধ কাটার পরও ঘরে ঢুকে চুরি করা তার পক্ষে সম্ভবপর হয়নি। মূলকথা হলো, আল্লাহ যার মুহাফিয হয়ে যান তার ঘরে সাতটি কেন, সাতশতটি সিধ কাটলেও কোন চোরের পক্ষে ঘরে ঢুকা সম্ভব হবেনা। এরূপ আরোও অনেক ঘটনা লোক মুখে শুনা যায়।

(৩) হিংস্র বাঘের এ কোন কান্ড

হযরত ছিরামপুরী ছাহেব ক্বিবলাহ পদব্রজে সফর করতেন প্রচুর। বাড়ি ফিরতেন গভীর রাতে। বড্ড সাহসী ছিলেন তিনি। একদিন রাতে এমনি বাড়ি ফিরছিলেন। হঠাৎ একটি বাঘ তাঁর পথ আগলে দাঁড়ালো। বনু আদমের ছায়া দেখে সে ক্রোধে হলো অগ্নিশর্মা। মাথায় চাপল খুনের নেশা। শুরু হলো লেজ গুটানো আর গগন কাঁপানো প্রচন্ড হুংকার। হযরত ক্বারী ছাহেব শুধু চেয়ে চেয়ে দেখলেন বাঘটির কারসাজি। মনে মনে বললেন, বাঘ হলে তো কী? আমিও কম কিসে? আল্লাহ চাহে তো আমিও দেখে নেব। চলল উভয় পক্ষের আক্রমণের চূড়ান্ত প্রস্তুতি। একসময় তিনি দেখলেন, বাঘটি কেমন যেন আনমনা হয়ে পড়ল। না, এবার মাথা নিচু করে উল্টো পথে ফিরে চলল এবং অবশেষে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

(৪) একটি ছড়িঃ একটি গল্প

ছড়ি নিয়ে মজার এই কাহিনীটি বর্ণনা করেছেন রাখালগঞ্জ ডি কিউ আলিম মাদ্রাসার সিনিয়র শিক্ষক মাওলানা মাহবুবুর রহীম ছাহেব। তাঁর ভাষায় ঘটনাটি নিম্নরূপ:

তখন আমি ফেঞ্চুগঞ্জের গঙ্গাপুর জামে মসজিদের ইমাম ছিলাম। একদিন হযরত ছিরামপুরী (রহঃ) গঙ্গাপুরের জনৈক ব্যক্তির দাওয়াতে ঐ গ্রামে তশরীফ নিয়েছিলেন। যুহরের নামায আদায়ের জন্য তিনি আমার মসজিদে গিয়ে নামাযের জামাতে শরীক হলেন। নামাযের পর হুজুরকে দেখে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হলাম। হুজুরকে আমার হুজুরাখানায় নিয়ে গেলাম। হঠাৎ আমার একটি সমস্যার কথা মনে পড়ল। বললাম হুজুর! ইমাম হিসেবে অনেক সময় লোকজন জ্বীন তাড়ানোর জন্য আমাকে নিয়ে যেতে আসে। আমি এ সম্পর্কে কোন কিছু জানিনা। তাছাড়া আমার ভয় করে বিধায় কোন কিছু শিখতেও আগ্রহী নই। হুজুর দয়া করে আমার এই বেতটি নেড়েচেড়ে দিলে আমি বড়ই উপকৃত হব। এই বলে আমি বেতটি হুজুরের হাতে দিলাম। হুজুর বেতটি হাতে নিয়ে একটু নেড়েচেড়ে আমার হতে ফিরিয়ে দিলেন। আমি বেতটি সযত্নে রেখে দিলাম। সপ্তাহ খানেক যেতে না যেতেই জ্বীন তাড়ানোর একটি কেইছ এসে গেল। আমি আমার মসজিদের মুয়াযযিন ঘিলাছড়া আশিঘর নিবাসী মৌঃ আব্দুল মন্নানকে বেতটি দিয়ে পাঠালাম। অবাক কান্ড! বাড়ীর নিচে থাকতেই জ্বীনটি চিৎকার দেয়া শুরু করল। আর বলতে লাগল, আমাকে ছেড়ে দাও, আমাকে যেতে দাও। মুয়াযযীন সাহেব এখানে আসার পূর্বেই আমাকে রেহাই দাও। আমি আর কোনদিন এখানে আসব না। দোহাই তোমাদের, আমাকে মুক্তি দাও। অবশেষে তার কাকুতি মিনতি শুনে তাকে ছেড়ে দেয়া হল। সামান্য এক বেতের কেরেশমা দেখে উপস্থিত সবাই অবাক হলেন। এভাবে বার কয়েক বেতটির অলৌকিক কেরেশমা উপভোগ করার পর একদিন বেতটি চুরি হয়ে গেল। আমি আবার নিঃস্ব হয়ে গেলাম।

(৫) জ্বীন যুবতীর অদ্ভুত খায়েশ:

ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন হযরত ছিরামপুরী (রহঃ) এর বড় ছাহেবজাদা হযরত মাওলানা

শামছুল হুদা ছাহেব। ঘটনাটি ছিল এরকম-

একবার জনৈক ব্যক্তি এসে বলল, হুজুর! আমার অমুকের উপর জ্বীনের আছর পড়েছে। দয়া করে আমাদের বাড়িতে আসলে বড়ই উপকৃত হব। ছিরামপুরী সাহেব ঐ ব্যক্তির আহবান উপেক্ষা করতে পারলেন না। তিনি তার বাড়িতে এসে উপস্থিত হলেন। রোগীকে তাঁর সামনে উপস্থিত করা হল। ছিরামপুরী সাহেব জ্বীনকে হাজির করে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কে? জ্বীনটি বলল, আমি জ্বীন সম্প্রদায়ের এক যুবতী মেয়ে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি এই লোকটির সাথে লেগেছ কেন? জ্বীনটি বলল, আপনার জন্য। তিনি বললেন, আমার জন্য কিভাবে? ঘটনা কী খুলে বলতো দেখি? জ্বীন মেয়েটি বলতে শুরু করল, আপনাকে অনেকদিন পূর্বে একবার দেখেছিলাম। এরপর থেকে আপনাকে খুঁজতে খুঁজতে আমি বেচারী হয়রান। অবশেষে এক ফন্দি আঁটলাম এবং এই ব্যক্তির সাথে লেগে গেলাম। ভাবলাম, আপনি যেখানেই থাকেন না কেন, আপনাকে নিয়ে আসা হবে। আর এভাবেই আপনার সাথে আমার সাক্ষাতের সুযোগ হবে। ছিরামপুরী সাহেব বললেন, তোমার উদ্দেশ্যটা কী? একটু বলতো। বলল, আমি আপনার পাণি প্রার্থী। আপনি সুযোগ দিলে আমি হব আপনার স্ত্রী এবং আপনি হবেন আমার শওহর। আচ্ছা বুঝলাম, বিষয়টিতো আমার সাথে, তাহলে এই ব্যক্তিকে কষ্ট দিচ্ছ কেন? তাকে ছেড়ে দাও। জ্বীনটি বলল, না, যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি আমাকে শাদী না করবেন ততক্ষণ পর্যন্ত আমি তাকে ছেড়ে যাব না। বললেন, ঠিক আছে, আমাকে যদি বিয়ে করতেই হয় তবে আর দেরী নয়, এখনই আমি পালকী নিয়ে আসছি। এই বলে তিনি একটি বড় শিশি হাতে নিয়ে জ্বীন মেয়েটিকে বোতলে ঢুকিয়ে দিলেন। এভাবেই দুষ্ট জ্বীন যুবতীর বিয়ের সাধ মিটল।

(৬) <u>আধাঁর রাতে আলোর ঝলক</u>

ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন হযরতের ছোট ছাহেবজাদা হযরত মাওলানা আবু আব্দিল্লাহ মুহাম্মদ আইনুল হুদা ছাহেব। হযরত ছিরামপুরী ছাহেব ক্বিবলাহ তাঁকে অত্যন্ত আদর করতেন। বাড়িতে আসলেই সব সময় কাছে কাছে রাখতেন। রাতে ঘুমানোর সময়ও তাঁকে পার্শ্বে নিয়ে ঘুমাতেন। এমনি একদিন তিনি তাঁর ওয়ালিদ মুহতারামের কাছে ঘুমিয়েছিলেন। হঠাৎ তাঁর ঘুম ভেঙ্গে গেল। তিনি দেখলেন ঘরখানা অদ্ভুত হলদে আলোতে ভরে উঠেছে। আর তাঁর ওয়ালিদ মুহতারাম কার সাথে যেন কথা বলছেন। এ অবস্থা দর্শনে তাঁর মধ্যে ভয়ের উদ্রেক হয়েছিল।কেননা তাঁর ওয়ালিদ মুহতারামের সাথে এমন একজনের বাক্যালাপ হচ্ছিল যাকে দেখা যাচ্ছিলনা।

(৭) <u>এক ধমকেই পগারপার:</u>

ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন ফেঞ্চুগঞ্জ উপজেলাধীন ঘিলাছড়া ইউনিয়নের আশিঘর গ্রামের জনাব আফতাব আলী। তিনি হযরত ছিরামপুরী সাবের সাথে অনেকদিন ছিলেন। তাঁর বর্ণিত ঘটনাটি এ রকম:

একদিন সুনামগঞ্জ থেকে দু'জন লোক ছিরামপুরী সাহেবের কাছে এসে বলল, হুজুর! আমরা বসবাসের জন্য নতুন একটি ঘর নির্মাণ করেছি। কিন্তু এখন পর্যন্ত আমরা ঘরটিতে যেতে পারিনি। কারণ, ঘরখানা নির্মাণের পর থেকেই ঐ ঘর থেকে রাতে প্রচন্ড আওয়াজ শুনা যায়। মনে হয় যেন ঘরটিতে বিশাল আকারের মোটরযান তীরবেগে ছুটে চলেছে।

হুজুর! অনেক চেষ্টা তদবীরের পর বিফল হয়ে অবশেষে আমরা আপনার নাম শুনে এখানে এসেছি। অনুগ্রহপূর্বক আমাদেরকে ফিরিয়ে দেবেন না। ছিরামপুরী সাহেব তাদের সাথে রওয়ানা হলেন। বাড়ি পৌছেই তিনি ঘরখানা দেখলেন। রাত হল। তিনি বাড়ির মালিককে একটি লেম্প ও একটি দিয়াশলাই দিতে বললেন। এগুলো নিয়ে তিনি একা ঐ ঘরে প্রবেশ করলেন এবং বাড়ির লোকজনকে ঘুমিয়ে পড়তে বললেন। ছিরামপুরী সাহেব ঐ ঘরটিতে প্রবেশ করে তাঁর প্রতিদিনের অভ্যাস মত তেলাওয়াত করে দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়লেন। গভীর রাতে প্রচন্ড এক আওয়াজে তাঁর ঘুম ভেঙ্গে গেল। তিনি বিছানায় উঠে বসলেন। দিয়াশলাই দিয়ে বাতি জ্বালালেন। বাতির আলোতে তিনি দরজার দিকে তাকালেন, দেখলেন দরজা খোলা। আর দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে বিশাল আকৃতির একটি ঘোড়া। তখন ছিরামপুরী সাহেব ' দূর হও' বলে একটি হাঁক দিয়েই হাতের লাঠি নিয়ে এক লাফে বিছানা থেকে নেমে দরজার দিকে এগোলেন। ঘোড়াটি দিল এক ভোঁ দৌড়। পেছনে পেছনে হুজুরও দৌড়াতে লাগলেন। অনেক্ষণ দৌড়ানোর পর ঘোড়াটিকে সামনে দেখতে না পেয়ে হুজুর আবার বাড়িতে ফিরে এলেন। এদিকে বাড়ির মালিক মোটেই ঘুমাননি। আজ কি হবে এই অজানা আশংকায় তার ঘুম আসেনি। গভীর রাতে হুজুরের হাঁক শুনে ঘর থেকে বের হয়ে দেখলেন, হুজুর লাঠি হাতে দৌড়াচ্ছেন। যাক হুজুর ফিরে এসে লোকটিকে বললেন, চিন্তার কোন কারণ নেই। আজ থেকে আর কোনদিন পূর্বের মত আওয়াজ শুনবেন না। পরদিন হুজুর বিদায় নিয়ে ফিরে আসলেন। পরে খবর নিয়ে জানা গেছে, সত্যিই আর কোনদিন কোন রকমের আওয়াজ শুনা যায়নি।

(৮) <u>দৈত্যের দেশে হযরত ছিরামপুরী (রঃ):</u>

ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন হযরত ছিরামপুরী (রহ:) এর স্ত্রী মুহতারামা রোকেয়া খাতুন। তাঁর বর্ণিত ঘটনাটি এরকম:

সিলেটের ভার্তখলায় একবার হযরত ছিরামপুরী (রঃ) গোসল করার জন্য একটি পুকুরে নেমেছিলেন। যেমনি তিনি পানিতে ডুব দিলেন, হঠাৎ অনুভব করলেন তাঁর পায়ের তলায় শুকনো মাটি। চারদিকে তাকালেন, দেখলেন একটি মুক্ত প্রান্তর, পানির কোন চিহ্ন মাত্রই নেই। কাছেই এক টুকরা বৃক্ষকান্ড দেখতে পেয়ে এটার উপর বসে হাতের আঙ্গুলে তাসবীহ পাঠ করতে লাগলেন। এমতাবস্থায় হঠাৎ দূর থেকে বাদ্যযন্ত্রের আওয়াজ শুনতে পেলেন। বাদ্যযন্ত্রের আওয়াজ শুনে তাঁর মধ্যে ক্রোধের উদ্রেক হল। তিনি বৃক্ষকান্ড থেকে উঠে দাঁড়ালেন। উদ্দেশ্য যে, অন্য কোথাও চলে যাবেন, যেখানে বাদ্যযন্ত্রের আঁওয়াজ শুনা যায় না। এ সময় কাছে একটি বাঁশখন্ড দেখতে পেয়ে কি মনে করে এটা বেয়ে উপরের দিকে উঠতে লাগলেন। এদিকে মহা হুলুস্থুল কান্ড ঘটে গেল। হযরত ছিরামপুরী সাহেবকে পানিতে ডুব দিতে কয়েকজন লোক দেখেছিলেন। অনেক্ষণ পর্যন্ত তাঁকে উঠতে না দেখে তারা হাঁক ডাক শুরু করল। এতে অনেক লোকের ভীড় জমে গেল। সবাই মহা চিন্তায় পড়ে গেলেন। সময় গড়িয়ে যাচ্ছে, কিন্তু ছিরামপুরী সাহেবের উঠার নাম নেই। পুকুর পাড়ে তাঁর লুঙ্গি গামছা ঠিকই পড়ে আছে। এ সংবাদ চতুর্দিকে যতই ছড়িয়ে পড়তে লাগল ততই লোক সমাগম বেড়েই চলল। অবশেষে সবাই মনে করলেন, যে তিনি পানিতে ডুবে মৃত্যুবরণ করেছেন। লোকজন পুকুরের তলা থেকে তাঁর লাশ উঠানোর জন্য জালের খোঁজে লোক পাঠালো। ঠিক এমনি মুহূর্তে ছিরামপুরী সাহেব পানির উপর ভেসে উঠলেন এবং কোন

রকমে ঘাট পর্যন্ত পৌছেই অজ্ঞান হয়ে গেলেন। লোকজনের অনেক সেবা শুশ্রূষার পর অবশেষে তাঁর জ্ঞান ফিরল। কিছুটা প্রকৃতিস্থ হয়ে তিনি উপস্থিত লোকজনকে শুনালেন তাঁর দৈত্যের দেশের ভ্রমণ কাহিনী।

(৯) মক্কায় দৈত্যের কবলে হযরত ছিরামপুরী (রহ)

যাঁরা আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন ও তদীয় রাসূলে পাকের খাঁটি আশিক্বানের দপ্তরে নিজ নাম অন্তর্ভুক্ত করতে পেরেছেন, তাঁরা পদে পদে বিভিন্ন বিপদের সম্মুখীন হয়েছেন। এমনি এক বিপদে পড়েছিলেন জনাব হুজুর ক্বিবলাহ। ঘটনাটি এ রকম:

হুজুর ক্বিবলাহ (রহ:) এর মেঝ ছাহেবজাদা হযরত মাওলানা নাজমুল হুদা ছাহেব বর্ণনা করেছেন যে, তিনি হুজুর ক্বিবলাহ (রহ:) এর কাছ থেকে ঘটনাটি শুনেছেন এভাবে যে, আমি হজ্ব পালন শেষে মককা শরীফ থেকে জেদ্দায় ফেরার পথে আমার মনে আসল যে, জীবনে আবার মককা শরীফ আসতে পারব কি না কে জানে? সুতরাং আল্লাহর বাড়ির এলাকাটি ভালভাবে দেখে শুনে যাই। যেই ভাবা সেই কাজ, আমি কাফেলা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে হেঁটে হেঁটে রওয়ানা হলাম। অনেকদূর যাওয়ার পর ক্লান্তি দূর করার জন্য একটি পাহাড়ের পাদদেশে বিশ্রাম নিতে শুয়ে পড়লাম এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই সুপ্তির কোলে ঢলে পড়লাম। একটি দৈত্য আমাকে একাকী নিশ্চিন্তভাবে শুয়ে থাকতে দেখে হয়ত ক্রোধান্বিত হয়ে পড়েছিল এবং আমাকে সমুচিৎ শাস্তি দেয়ার সিদ্ধান্তও নিয়েছিল। হঠাৎ কিসের শব্দে আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। চোখ খুলে দেখলাম, বিশালাকৃতির এক দৈত্য আমাকে পিষে ফেলার জন্য বিরাট স্তম্ভের মত পা যুগলের একটি পা উপরে উঠিয়েছে। এ অবস্থা দর্শনে আমিও ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে প্রচন্ড আওয়াজে একটি ধমক দিয়ে উঠলাম। সাথে সাথে দৈতটি উধাও হয়ে গেল। অতঃপর আমি আবার শুয়ে পড়লাম। দৈতটি আবার এসে উপস্থিত হল এবং আমাকে মেরে ফেলতে উদ্যত হল। আল্লাহর হুকুমে এবারও আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। জ্বালালী আওয়াজ দিয়ে লাফ মেরে উঠে বসলাম। এবারও সে পালিয়ে গেল। এভাবে তিনবার ঘটনার পূনরাবৃত্তি ঘটল। এবার আমি চরম বিরক্তিবোধ করলাম। তাকে শুনিয়ে শুনিয়ে হুংকার দিয়ে বললাম, অহেতুক আমাকে কষ্ট দিলিরে পাপিষ্ঠ। আল্লাহর বাড়িতে আছি বলে তোর এই অসদাচরণের কোন প্রতিশোধ নিলাম না। তবে তোকে দাওয়াত করে যাচ্ছি, পূর্ব-পাকিস্তানের সিলেট নগরীতে আমার বাড়ি। সাহস থাকে তো সেখানে যাবি, তোর যুলুমের সাধ চিরতরে মিটিয়ে দেব।

(১০) গভীর রাতে কান্নার আওয়াজ:

ঘিলাছড়া নিবাসী জনাব আফতাব আলী সাহেব বর্ণনা করেন যে, মামুজী (তিনি হুজুরকে মামুজী বলে ডাকতেন) তখনও ঘিলাছড়ায় বাড়ি করে আসেননি। আমরা তাঁকে প্রায়ই আমাদের গ্রামে নিয়ে আসতাম। ঘিলাছড়া বা পার্শ্ববর্তী কোন এলাকায় এলে তিনি আমাদের বাড়িতেই রাত যাপন করতেন। আমাদের একটি বাংলা ঘর ছিল। ঐ ঘরটিতেই আমরা তাঁর রাত যাপনের জন্য বিছানা পেতে দিতাম। এমনি একরাতে তিনি আমাদের বাড়িতে অবস্থান করছিলেন। আমি কি এক কাজে বাড়িতে ছিলাম না। বাড়ি ফিরতে গভীর রাত হয়ে গিয়েছিল। বাংলা ঘর পেরিয়েই তবে বড় ঘরে যেতে হত। আমি যখন বাংলা ঘরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম তখন ঐ ঘর থেকে কান্নার আওয়াজ শুনতে পেলাম। হঠাৎ কান্নার আওয়াজ শুনে আমি থমকে দাঁড়ালাম। কান পেতে শুনে বুঝতে পারলাম মামুজী কাঁদছেন।

ভাবতে ভাবতে বড় ঘরে গিয়ে আম্মাজানকে ডাকলাম। ঘড়ি দেখলাম, রাত তখন আড়াইটা। আম্মাজান দরজা খুললেন। আমি তাঁকে মামুজীর কান্নার কথা বললাম। তিনি আমাকে নিয়ে বাংলা ঘরের বারান্দায় উপস্থিত হলেন। উভয়ে দেয়ালের কাছে চুপ মেরে দাঁড়িয়ে থাকলাম। তখন শুনলাম, তিনি কি যেন বলছেন আর কাঁদছেন। বড়ই ব্যাকুল সেই কান্নার সুর। তিনি কাঁদছিলেন আর বলছিলেন:

ধুড়িলে বন্ধুরে মিলে আছেন বন্ধু শ্রীপুর,
আগে চিন মুহাম্মাদী নূর। মুহাম্মাদী নূর না চিনিলে,
মারা খাইবে দুনু কুল।

আম্মাজান বললেন, চলরে, ঘরে ফিরে যাই। তোর মামুজান বিশেষ হালে আছেন। তিনি এখন তাঁর নিজের মধ্যে নেই। উনাকে বিরক্ত করাটা মোটেই ঠিক হবে না। ঘরে ফিরে গেলাম। কিন্তু আমার চোখে ঘুম আসছিল না। মানসপটে কেবল মামুজানের সেই কথাটি ঘুরে ফিরে ভাসতে লাগল " আগে চিন মুহাম্মাদী নূর"।

(১১) হত্যার পরিকল্পনা:

উক্ত জনাব আফতাব আলী সাহেব বর্ণনা করেন যে, একবার ছাতক সিমেন্ট ফ্যাক্টরীর একজন কর্মচারীর উপর এক দূষ্ট জ্বীনের আছর পড়েছিল। কর্মচারীর কয়েকজন লোক হযরত ছিরামপুরী (রঃ) এর কাছে তদবীরের জন্য আসলেন। তিনি বললেন ঠিক আছে, অমুক দিন যাব। দুষ্ট জ্বীন যখন জানতে পারল যে, ছিরামপুরী সাহেব তাকে শায়েস্তা করার জন্য আসছেন তখন সে ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠল। সে মনে মনে পথে তাঁকে হত্যা করার পরিকল্পনা করল। নির্ধারিত তারিখে হুজুর সিমেন্ট ফ্যাক্টরীতে আসছিলেন। পথিমধ্যে তিনি চেয়ে দেখলেন, এক কিম্ভুতকিমাকার কালো নেংটা ভুত তাঁর অদূরে পথ আগলে দাঁড়িয়ে আছে। হুজুর বুঝতে পারলেন যে, এটা কোন দুষ্ট জ্বীনই হবে। তিনি থমকে দাঁড়িয়ে অন্য একটি পথ ধরে গন্তব্যস্থলে গিয়ে পৌছলেন। রোগীকে তাঁর সামনে উপস্থিত করা হল। হুজুর দুষ্ট জ্বীনকে হাজির করলেন। জ্বীন তাঁকে প্রশ্ন করল, হুজুর! আপনি এখানে আসলেন কেমন করে? তিনি জবাব দিলেন, কেন রাস্তা দিয়ে হেঁটে হেঁটে আসলাম। জ্বীনটি অবাক কণ্ঠে বলল, আমরা তো রাস্তায় আপনাকে হত্যা করার জন্য অপেক্ষা করছিলাম। হুজুর জবাব দিলেন, হ্যাঁ আমি তা জানি। পথে আমি তোমাদের একদম নিকটে উপস্থিত হয়েছিলাম। কিন্তু তোমরা আমাকে দেখতে পাওনি। কারণ আমার পাঞ্জাবীর পকেটে ছিল আল্লাহর কালাম। আর এই কালামুল্লাহর কারণেই তোমরা আমাকে দেখতে পাওনি। আর এখন এই কালামুল্লার দ্বারাই আমি তোমাদেরকে শায়েস্তা করব। এই বলে তিনি বিভিন্ন তদবীর শুরু করলেন।

(১২) প্রখর বুদ্ধিমত্তা

হযরত ছিরামপুরী (রহ :) ছিলেন প্রখর বুদ্ধিমত্তার অধিকারী। তিনি অনেক সময় প্রখর মেধা দিয়ে কঠিন কঠিন সমস্যার সমাধান দিয়ে থাকতেন। নিম্নে এ সম্পর্কিত একটি ঘটনার অবতারণা করা হল-

ঢাকাদক্ষিণ বাদেদেওরাইল নিবাসিনী মোছাম্মাত তুহফাতুন নেছা চৌধুরী একটি ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন। ঘটনাটি ছিল এ রকম:

একবার তাদের বাড়িতে দেখা দিল এক অজানা আতঙ্ক। রাত গভীর হলেই কারা যেন তাদের বাড়ির চালের উপর ঢিল ছুঁড়ত। এক রাত নয়, দু' রাত নয়, প্রতিরাতেই এমন ঘটনা

ঘটতে লাগল। লোকেরা বলাবলি করতে লাগল যে, এটা দুশমনের কাজ। ঘটনার বর্ণনাকারিনীর স্বামী মাকৃছুদ আহমদ চৌধুরী ছিলেন ঐ এলাকার চেয়ারম্যান। তিনি এমন আশংকা উড়িয়ে দিয়ে বললেন, অসম্ভব, আমার এমন কোন দুশমন নেই যে এরকম কাজ করার সাহস রাখে। তদুপরি সতর্কতা স্বরূপ তিনি কতিপয় সাহসী নওজোয়ান পাহারাদার বাড়ির চারিদিকে নিয়োগ করলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হলনা। রাত একটু গভীর হলেই সেই ঢিল, সেই ভীতিকর আওয়াজ- গুড়ুম..। দিশেহারা হয়ে অবশেষে বাড়ির সবার এ বিশ্বাস জন্মিল যে এটা জ্বীনের কাজ। তুহফাতুননেছা চৌধুরী তাঁর স্বামীকে হযরত ছিরামপুরী (রহ:) এর কথা বললেন। উল্লেখ্য যে, হযরত ছিরামপুরী ছাহেব (রহ:) এর সাথে তাদের আত্নীয়তার সম্পর্ক ছিল। চেয়ারম্যান সাহেব তাঁকে নিয়ে আসার জন্য লোক পাঠালেন। তিনি আসলেন। ঘটনাটি বিস্তারিত শুনে তিনি মুচকি হেসে বললেন, এটা জ্বীনের কারবার নয়, বরং মানুষেরই কাজ। কিছুক্ষণ চুপ থেকে তিনি আবার বললেন, এই মানুষটি আপনাদের ঘরেই আছে। অতঃপর তিনি গোপনে কিছু পরামর্শ দিয়ে বিদায় নিয়ে চলে আসলেন। পরের রাত। সবাই রাতের খাবার খেতে বসেছেন। এমন সময় সেই আঁতকে উঠা আওয়াজ- গুড়ুম..। গৃহিনীর চট করে মনে পড়ে গেল হযরত ছিরামপুরী (রহ:) এর দেয়া পরামর্শ। তাড়াতাড়ি ঘরের সবাইকে লক্ষ্য করে দেখলেন। নাহ, সবাই তো আছে, তাহলে...? তড়িৎ একটি সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলেন। দরজা খুলে ঢিলের আওয়াজ লক্ষ্য করে ছুটলেন সাহসী এই চেয়ারম্যান-পত্নী। রাতের আঁধারে অদূরেই তিনি দেখতে পেলেন একটি ছায়ামুর্তি। আরেকটু কাছে যেতেই চক্ষু চড়কগাছ। আরে, এ যে আমাদের কাজের বুয়া!

ঃ এই তুই এখানে কী করছিস?

ঃ প্রকৃতির ডাকে এসেছি আম্মা।

ঃ আয় ঘরে আয় হারামজাদী.. বলে তিনি ঘরে ঢুকতে ঢুকতে ভাবনায় পড়ে গেলেন ঘরে বাথরুম থাকতে বাইরে গিয়ে....। স্বামীকে সব কথা খুলে বললেন। আহার পর্ব শেষ করে চেয়ারম্যন সাহেব বুয়াকে ডেকে পাঠালেন। জিজ্ঞেস করলেন:

ঃ কিরে, চালের উপর ঢিল ছুড়ে কে? বলতো দেখি?

ঃ কী যে কন মালিক, এত লোক বাড়ি ঘেরাও কইরাও টাহর করতে পারে না, সেহানে আমি কেমনে কইতে পারুম?

ঃ বুঝেছি, সোজা আঙ্গুলে ঘি উঠবে না। চেয়ারম্যন সাহেব হাঁক দিলেন, এই কে আছিস, এই শয়তানীকে শক্ত করে বেঁধে রাখ। আর আমার ছড়িটা গেল কোথায়? নিয়ে আয়। হাকীমের ঘরে বেতমীযী.....

বুয়া আঁতকে উঠল, ওরে বাপরে, চেয়ারম্যানের ফরমান...। ভয়ে কেঁদে ফেলল সে। কান্নামিশ্রিত কণ্ঠে বলে উঠল -

ঃ আমারে মাইরেন না মালিক, আমি সব খুইল্যা কইতাছি।

এরপর কাজের বুয়াটি জানের মায়ায় একে একে সব কিছু স্বীকার করল। বাড়ির সবাই অবাক হয়ে শুনছিলেন সামান্য এক কাজের বুয়ার দুঃসাহসিক কর্মকান্ড। বিবৃত ঘটনাটি এই পর্যন্তই।

হযরত ছিরামপুরী (রহ:) কে আনা হয়েছিল জ্বীন তাড়ানোর জন্য। পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে তিনি দিলেন বুদ্ধিভিত্তিক পরামর্শ। এতেই এল একটি পরিবারে প্রশান্তি ও স্বস্তি।

জ্বীনদের গায়েব জানা সম্পর্কে হযরত ছিরামপুরী (রহ:) এর মতাদর্শ

হুজুর কেবলার মেঝো সাহেবজাদা মাওলানা নজমুল হুদা ছাহেব বলেন, জ্বীন সম্পর্কে আমার ওয়ালিদ মুহতারাম (র:) এর বিশ্বাস ছিল যে, জ্বীনরা গায়েব জানে না। সুতরাং বাস্তবতার নিরিখে হাজিরাত বলতে কিছুই নেই। এটা রুজি-রুটি অর্জনের ধান্ধা বৈ কিছুই নয়। হুজুরের দৃষ্টিতে জ্বীনদের একই জায়গায় বসে গায়েবের বিষয়াবলী গড়গড় করে মুখস্ত বলে দেয়া সম্ভব নয়। এ ধরনের বিশ্বাস পোষণ করা ঈমান হরণকারী। শেখপুর থাকাকালে একবার হুজুরের জনৈক দোস্ত তাঁকে খুবই আগ্রহ সহকারে দাওয়াত করলেন এই মর্মে যে, আজ রাতে অত্র গ্রামের অমুকের বাড়িতে হাজিরাত হবে। আপনি তো হাজিরাত বিশ্বাস করেন না। আজ যেভাবেই হোক আপনাকে সেখানে নিয়ে যাব। দেখবেন, উপস্থিত সবার সকল সমস্যার সমাধান কীভাবে করে দেয়? অনেক পীড়াপীড়ির পর রাতে হুজুরকে নিয়ে গেলেন। ঘরের বাতি নেভানো হল এবং হাজিরাত আরম্ভ হল। জ্বীন এক এক করে সবার বক্তব্য শুনে গড়গড় করে মুখস্ত সমাধান করে দিল। সবার শেষে আসল হুজুরের পালা। জ্বীন তাঁকে জিজ্ঞেস করল বলুন, আপনার কী সমস্যা? হুজুর বললেন, আমার মেঝো ছেলের কী হয়েছে? সারা রাত কেবল কান্নাকাটি করে। জ্বীন বলল, তার শরীরে ডাইনীর নজর লেগেছে। যাক হাজিরাত শেষ হল। হুজুর তাঁর দোস্তকে নিয়ে চলে আসলেন। পথে দোস্তকে জিজ্ঞেস করলেন, জ্বীন মানুষের অদৃশ্যের সব খবর বলে দিতে পারে বলে আপনার যে ধারণা তা কী এখনও বহাল তবিয়তে আছে? দোস্ত বললেন, হুজুর! আল্লাহ ক্ষমা করুন। আমি বিরাট এক ভ্রান্তির বেড়াজালে আবদ্ধ ছিলাম। আজ থেকে আমি মুক্ত। আমি তওবা করছি। আমার জন্য দোয়া করুন। অবাক কান্ড, আপনি এখনও বিয়েই করেননি, অথচ বলে কিনা আপনার মেঝো ছেলেকে ডাইনী নজর দিয়েছে? মিথ্যা, সব মিথ্যা। হাজিরাত বলতে কিছুই নেই। এটা ধোকা ছাড়া কিছুই নয়।

বস্তুত: হুজুর কেবলার এই বিশ্বাসই হল কোরআন-সুন্নাহ সমর্থিত বিশ্বাস। কেননা গায়েব জানার ক্ষেত্রে ইসলামী শরিয়তের নির্দেশনা এই যে, একমাত্র আল্লাহ পাকই গায়েব জানেন। নবী ও রাসূলগণ গায়েব জানেন না। তবে আল্লাহ প্রদত্ত ধারায় গায়েবের খবর জানেন। আর জ্বীনরা গায়েব তো জানেইনা, উপরন্তু গায়েবের খবরও জানে না। কেননা এরা নবী-রাসূল না হওয়ায় আল্লাহ প্রদত্ত কোন ধারার আওতায় পড়ে না। এদের গায়েব না জানার ব্যাপারে কোরআনে পাকে ইরশাদ হচ্ছে: فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل منسأته. فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. অর্থাৎ হযরত সুলাইমান (আ:) যখন ওফাৎ প্রাপ্ত হন, তখন একমাত্র উঁই পোকাই তাঁর হেলান দেয়া লাঠি খেয়ে তাঁর মৃত্যু নিশ্চিত করে। অতঃপর লাঠি ভেঙ্গে তিনি যখন পড়ে গেলেন, তখন বায়তুল মাকদিছ নির্মাণ কার্যে কর্মরত জ্বীনদের কাছে তাঁর মৃত্যুর খবর প্রকাশ পেল। আরও প্রকাশ পেল যে, যদি তারা গায়েব জানত তবে এক বছর আগে সুলাইমান (আ:) এর মৃত্যুবরণের খবর জানতে পারত এবং এতদিন এত অপমাণজনক কষ্ট ভোগ করত না।

তবে জ্বীনরা অল্প সময়ে খবর সংগ্রহ করে সরবরাহ করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, একবার মোগলাবাজার এলাকায় (গ্রামের নাম বর্ণনাকারীর মনে নেই) এক ব্যক্তিকে জ্বীন আছর করল। তদবীরকারকগণ একে একে আসলেন গেলেন। কিন্তু জ্বীনটিকে

কেউ তাড়াতে সক্ষম হলেন না। অবশেষে জ্বীনটি মুখ খুলল। বলল, আমি যে হুজুরের অপেক্ষা করছি তোমরা তাঁকে নিয়ে আসছ না কেন? তারা বলল, কোন হুজুরকে নিয়ে আসব? কেন, জ্বীন জাতি যাঁকে অত্যন্ত সমীহ করে তোমরা সেই ছিরামপুরী সাহেবকে নিয়ে এস। তারা হুজুরকে তাদের বাড়িতে দাওয়াত করে নিয়ে গেল। হুজুরকে দেখামাত্র জ্বীনটি সালাম ও কদমবুসী জ্ঞাপনপূর্বক বলল, হুজুর! আপনি আমার দাদা উস্তাদ। আপনার শাগরিদ জনাব কারী আব্দুর রাযযাক গওহরপুরী সাহেবের কাছে আমি পড়েছি। উনার মুখে আপনার এত বেশী আলোচনা শুনেছি যে, আপনার সাথে সাক্ষাৎ করে আপনার পবিত্র জবানের দু' চারটি কথা শুনে এবং আপনার দোয়া লাভ করে ধন্য হওয়ার লোভ সংবরণ করতে পারিনি। তাই ফন্দি করে এই লোকটির সাথে এই ভেবে লেগে গেলাম যে, তারা অবশ্যই আপনাকে নিয়ে আসবে। কিন্তু তারা যেন তেন লোক এনে সময় দীর্ঘায়িত করেছে এবং কষ্ট পেয়েছে। যাক আমার লক্ষ্য অর্জিত হয়েছে। এবার আমি চলে যাচ্ছি। দোয়ার দরখাস্ত রইল। জ্বীনটির বিদায় মুহূর্তে পাশের বাড়ির একজন লোক এসে বলল, হুজুর দয়া করে আমাদের লন্ডন প্রবাসী দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত একজন ভাইয়ের বর্তমান অবস্থাটা ওর কাছ থেকে জেনে দিন। হুজুর বললেন, সে এখান থেকে লন্ডনের খবর কী বলবে? তারা বলল, জ্বী হুজুর, তারা পারে। আপনি তাকে জিজ্ঞেস করে দেখুন। তাদের পীড়াপীড়িতে অবশেষে হুজুর ঐ জ্বীনকে এ ব্যাপারে কিছু জানে কি না জিজ্ঞেস করলেন। জ্বীনটি বলল, হুজুর! আমি এখান থেকে লন্ডনের খবর কী বলব? আমি গায়েব জানি নাকি? তবে আপনি আদেশ করলে আমি তথায় গিয়ে খবর সংগ্রহ করে শেষ রাতে ফিরে এসে আপনাকে বলতে পারব। হুজুর বললেন, তাই হোক। শেষ রাতে সে ফিরে এসে জানাল যে, তাদের ভাইয়ের ব্যাপারে লন্ডনের ডাক্তাররা জবাব দিয়ে দিয়েছে। তারা বলেছে এই রোগীর আর কোন চিকিৎসা নেই। সে দেশে ফিরে যাক। বর্তমানে সে দেশে ফিরে আসার প্রস্তুতি নিচ্ছে। আগামী বৃহস্পতিবারে সে দেশে চলে আসবে। এই বলে সে বিদায় নিয়ে চলে গেল। পরে সত্যিই তারা অবিকল এই মর্মে তাদের ভাইয়ের কাছ থেকে চিঠি পেল। মুমুর্ষ অবস্থায় দেশে ফিরে আসার পর তাকে শেষ তওবা করানোর জন্য তারা হুজুর কেবলাকে দাওয়াত করে তাদের বাড়িতে নিয়ে গেল। তিনি তাকে তার জীবনের শেষ তওবা করালেন। বিদায় মুহূর্তে তিনি তাঁকে এক ফাইল ঔষধের নাম লিখে দিয়ে আসলেন। হুজুরের পাক জবান থেকে প্রাপ্ত ঔষধ সেবনের ফলে মৃত্যুর সনদপ্রাপ্ত ঐ ব্যক্তি আরও অনেক দিন বেঁচেছিলেন।

বর্ণিত আছে যে, হযরত দাউদ (আ:) পবিত্র বায়তুল মাকদিস নির্মাণের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। অত:পর নির্মাণ কার্য চলতে থাকে। কিন্তু নির্মাণ কার্য শেষ হওয়ার পূর্বেই তিনি ইন্তিকাল করেন। ইন্তিকালের পূর্বে তিনি তদীয় ছেলে হযরত সুলাইমান (আ:) কে নির্মাণ কাজ শেষ করার ওসিয়ত করে যান। হযরত সুলাইমান (আ:) জ্বীন সম্প্রদায়কে অসম্পূর্ণ কাজ সম্পূর্ণ করতে আদেশ দিলেন। অত:পর যখন তার মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এল এবং আল্লাহ পাক তাকে তা জানালেন, তখন তিনি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করলেন, যেন নির্মাণ কাজ শেষ হওয়া পর্যন্ত তার মৃত্যুর সংবাদ গোপন রাখা হয়। তাহলে বায়তুল মাকদিস নির্মাণ কাজও শেষ হয়ে যাবে এবং গায়েব জানে বলে জ্বীনদের যে ধারণা তাও বাতিল বলে প্রমাণিত হবে। অত:পর তিনি জ্বীনদেরকে ডেকে তাকে ঘিরে দরজা বিহীন একটি কাঁচের মহল তৈরী করে দিতে বললেন। মহল তৈরী হয়ে গেলে তিনি লাঠির উপর

হেলান দিয়ে নামায আদায়ে মাশগুল হয়ে গেলেন। এ দিকে বায়তুল মাকদিসের নির্মাণ কাজ এগিয়ে চলল। এই অবস্থায় এক পর্যায়ে তিনি ওফাৎপ্রাপ্ত হয়ে গেলেন। আল্লাহ পাক তাঁকে লাঠির উপর হেলান দেয়া অবস্থায় স্থির রেখে দিলেন। কিন্তু উঁই পোকা লাঠিটি খেতে শুরু করল। এদিকে নির্মাণ কাজও সমাপ্তির পথে ধেয়ে চলল। একসময় লাঠিটি ভেঙ্গে নবী সুলাইমান (আ:) মাটিতে পড়ে গেলেন। তখন নির্মাণ কাজ শেষ হয়ে গিয়েছিল। এবার কর্মরত জ্বীনরা হযরত সুলাইমান (আ:) এর ওফাতের বিষয়টি জানতে পারল। তারা উঁই পোকাকে একখন্ড কাঠে রেখে দিল। একদিন ও একরাতে পোকারা যা খেল সেই পরিমাণের আলোকে তারা হিসেব করে দেখল যে, এক বৎসর পূর্বে তিনি ইন্তিকাল করেছেন। তখন তাঁর বয়স ছিল ৫৩ বৎসর। ১৩ বছর বয়সে তিনি রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। দায়িত্ব গ্রহণের ৪ বৎসর পর বায়তুল মাকদিসের নির্মাণ কাজ শুরু হয়। (জালালাইন শরীফ)

জ্বীন সাধন সম্পর্কে হযরত ছিরামপুরী (রহ:) এর ধারণাঃ

মাওলানা নজমুল হুদা সাহেব বলেন, জ্বীন সাধন সম্পর্কে আমার ওয়ালিদ মুহতারাম (রহ:) এই বিশ্বাস পোষণ করতেন যে, জ্বীন সাধন করা গোনাহে কবীরাহ। আল্লাহকেই সাধন করা মানুষের কর্তব্য। মানুষ পৃথিবীতে এসেছে আল্লাহকে সাধন করার জন্য, জ্বীনকে নয়। তিনি বলতেন, من له المولى فله الكل অর্থাৎ "যে ব্যক্তি আল্লাহকে সাধন করতে সক্ষম হয়েছে দুনিয়া ও আখেরাতের সব কিছু তার আয়ত্বে এসে গেছে। তার হারাবার আর কিছুই নেই"। হুজুর কেবলাহ তাঁর মাহবুব আল্লাহ পাককে পূর্ণরূপে সাধন করতে পেরেছিলেন বলেই চোর তাঁর কদু ক্ষেত থেকে কদু চুরি করে নিয়ে যেতে পারেনি। তাঁর ছোট ঘরটিতে সাত সাতটি সিধ কেটেও চোর ঘরে ঢুকতে পারেনি। যে জ্বীনকে সাধন করার জন্য মানুষ অনেক ত্যাগ তিতিক্ষা স্বীকার করে সে জ্বীন সম্প্রদায়ের সন্ত্রাসীরা হুজুর কেবলার হাতে সারা জীবন মার খেয়েছে, লাঞ্ছিত ও অপমাণিত হয়েছে। একবার জনৈক ব্যক্তি হুজুরের কাছে এসে বললেন, হুজুর! আপনার কাছে তো অনেক জ্বীন পড়াশোনা করে। আমি একান্ত গরীব মানুষ। আয় রোজগারের তেমন কোন উপায় নেই। দয়া করে কোন একটি জ্বীনকে আমার বশীভূত করে দিন। হুজুর তাকে বললেন, আপনি এই গোনাহের কাজ থেকে বিরত থাকুন। আমার পরামর্শ হচ্ছে, আপনি আল্লাহকে সাধন করতে নিয়োজিত হয়ে যান এবং আল্লাহকে সাধন করে ফেলুন। সব কিছু আপনার হয়ে যাবে। ব্যর্থ হয়ে ঐ ব্যক্তি জৈন্তায় গিয়ে অনেক টাকা পয়সা খরচ করে জনৈক জ্বীন সাধকের কাছ থেকে একটি জ্বীন সাধন করে নিয়ে বাড়ি রওয়ানা হলেন। কিন্তু বাড়িতে এসে শিখে আসা পদ্ধতি প্রয়োগ করে জ্বীনটিকে উপস্থিত করতে পারলেন না। তিনি আবার জৈন্তায় গিয়ে সাধকজীকে বিষয়টি জানালেন। সাধকজী জ্বীনকে ডেকে জিজ্ঞেস করলে সে বলল, আমি আপনার আদেশ মত লোকটির সাথে রওয়ানা হয়েছিলাম। সুরমা নদী পর্যন্ত যাওয়ার পর সামনে শুধু আগুন আর আগুন দেখে সামনে এগুতে পারিনি। খবর নিয়ে জানতে পারলাম যে, ছিরামপুরী ছাহেব কিবলা নামে একজন মহান বুযুর্গ আছেন, ঐ বুযুর্গের ১০বর্গমাইল এরিয়ায় কোন সাধনকৃত জ্বীন ঢুকা নিষেধ। ঢুকতে হলে উনার পারমিশন নিতে হয়। তখন সাধকজী পারমিশন নিয়ে আসার জন্য ঐ ব্যক্তিকে পরামর্শ দিল। তিনি বললেন, পারমিশন পাওয়া যাবে না। উনি জ্বীন সাধন করাকে গোনাহের কাজ বলে মনে করেন। সাধকজী বলল, তাহলে আর কী করা যাবে? বাড়ি ফিরে যান। ঐ হুজুরের পারমিশন ছাড়া কোন কিছু করা যাবে না।

ছিরামপুরী ছাহেবের জীবনের কতিপয় তাৎপর্যপূর্ণ দিক

সৃষ্টির সেবা

হযরত ছিরামপুরী (রহ:) এর অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল সৃষ্টির সেবা। বলা হয়েছে, خير الناس من ينفع الناس অর্থাৎ "মানুষের মধ্যে সেই সর্বোত্তম, যে মানুষের উপকার করে"। পবিত্র ক্বোরআনে কারীমেও বলা হয়েছে: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر অর্থাৎ "তোমাদেরকে মানুষের কল্যাণের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে"। হযরত ছিরামপুরী ছাহেব ক্বিবলাহ (রহ:) তাঁর সারাটি জীবন সৃষ্টির সেবায় কাটিয়েছেন। এই মহান ব্যক্তির 'সৃষ্টির সেবা' শিরোনামের আলোকে কয়েকটি বিষয়ের অবতারণা করা প্রয়োজন বলে মনে করি।

নিজ পরিবার:

পারিবারিক সূত্রে জানা যায় যে, হযরত ছিরামপুরী ছাহেব ক্বিবলাহ (রহঃ) প্রায়ই দ্বীনের সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন কাজের দরুন বাইরে থাকতেন। মাঝে মধ্যে বাড়িতে থাকতেন। অনেক দিন এমনও হয়েছে যে, গভীর রাতে বাড়ি এসেই তিনি ছেলে মেয়েদের সবাইকে কাছে ডেকে এনে বসাতেন। ক্বোরআন হাদীছের আলোচনা করতেন। হেদায়াতের বাণী শুনাতেন। বিশেষ করে পরিবারের সবাইকে পর্দা নিয়ে ক্বোরআন হাদীছের বোধগম্য আলোচনা করতেন। হযরত ছাহেব ক্বিবলাহর (রহঃ) এর পরিবারের সদস্যগণ বলেছেন, আমরা এমনিতেই পর্দা বিষয়ে অনেক সচেতন থাকতাম। তদুপরি তাঁর মর্মস্পর্শী আলোচনার দরুন আমাদের মধ্যে বাড়তি অনুপ্রেরণা কাজ করত। এছাড়াও তিনি আমাদেরকে বিভিন্ন মাসাঈল শিক্ষা দিতেন। মাঝে মধ্যে বাড়িতে আসতে তাঁর গভীর রাত হয়ে যেত। এসেই তিনি ছেলেদেরকে ঘুম থেকে ডেকে তুলে কাছে বসিয়ে ক্বোরআন তেলাওয়াতের মশক্ব দিতেন।

বিভিন্ন স্থানে খেদমতে খালক্ব:

হযরত ছিরামপুরী ছাহেব ক্বিবলাহ (রহঃ) অনেক দিন শেখপুর গ্রামে ইমামতি করেছিলেন। আবার মানিককোনায়ও তিনি অনেকদিন ইমাম ছিলেন। এসব এলাকায় তিনি শুধুমাত্র একজন ইমামই ছিলেন না, বরং সেখানকার মুরব্বীদেরকে একত্রিত করে তিনি ক্বোরআনে কারীমের তেলাওয়াতের শিক্ষা দিতেন। ছিরামপুরের গয়বী নামক এলাকায় একটি মসজিদেও তিনি প্রতি বৃহস্পতিবারে এলাকার শিক্ষিত অশিক্ষিত সবাইকে একত্রিত করে পবিত্র ক্বোরআনে কারীমের তেলাওয়াতের শিক্ষা দিতেন। এছাড়াও তিনি রাখালগঞ্জে দারুল ক্বোরআন মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করে সেখানে ক্বোরআন তেলাওয়াতের তালীম দিতেন। দূর দূরান্ত থেকে অনেক লোক তার শিষ্যত্ব লাভের আশায় সেখানে আসতেন। বর্তমানে সেই ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠানটি রাখালগঞ্জ দারুল ক্বোরআন আলিম মাদ্রাসা নামে সুপরিচিত।

কোরআন-হাদীস ভিত্তিক চিকিৎসা

পীরে কামিল হযরত বদরপুরী ছাহেব (রহ:) হযরত ছিরামপুরী (র:) কে ইসলামী চিকিৎসার অনুমতি প্রদান করেন। ঐ সময় তিনি হাদীস শরীফের ঐ বাণী পাঠ করেছিলেন, خير الناس من ينفع الناس অর্থাৎ "মানুষের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি সেই, যে মানুষের উপকার করে"। এটাই খেদমতে খালক্ব। তাবিজাত বলতে এক প্রকারের ইলাজ, যা

ক্বোরআনের আয়াত লিখে ব্যবহার করতে দেয়া হয়। সাধারণতঃ মানুষ চরম বিপদাপন্ন হয়েই চিকিৎসা নিতে আসে। অনেক সময় সব ধরনের ডাক্তারী চিকিৎসা বিফল হয়ে যাওয়ার পর মানুষ ক্বোরআনে করীমের প্রতি অবিচল আস্থা থাকার দরুন রোগ মুক্তির জন্য একটি আয়াত হলেও ব্যবহার করতে চায়। এটা তাদের কোরআনের প্রতি এহতেরাম ও ঈমানের বহিঃপ্রকাশ। এ জন্য হযরত বদরপুরী সাহেব (রঃ) হযরত ছিরামপুরী সাহেব (রঃ) কে তাবিজের মাধ্যমে খেদমতে খালক্বেরও অনুমতি প্রদান করেছিলেন এবং সাথে সাথে এটাও বলে দিয়েছিলেন যে, তাবিজের মাধ্যমে টাকা উপার্জনের চিন্তা করোনা। মুর্শিদে কামিলের উপদেশকে হযরত ছিরামপুরী (রঃ) আজীবন মেনে চলেছিলেন। তাঁর মেঝো সাহেবজাদা বর্ণনা করেন যে, ছোটকালে তিনি তাঁর আব্বাজানের সাথে হাওরী পথে রাখালগঞ্জ মাদ্রাসায় আসতেন। দূরত্ব ছিল ৩ মাইল; কিন্তু সকালে রওয়ানা দিয়ে কোন কোন দিন জোহরের সময় মাদ্রাসায় পৌছতেন। কারণ, রাস্তায় হাল-চাষ বন্ধ করে লোকজন তাবিজ নেয়ার আব্দার করত। তিনিও সন্তুষ্ট চিত্তে জমীনের আইলে বসে তাদেরকে তাবিজ লিখে দিতেন। লোকজন তো আর হাওরে টাকা-পয়সা নিয়ে আসেনি। সেদিকে তাঁর ভ্রুক্ষেপ ছিল না। সৃষ্টির সেবাই তাঁর মূল লক্ষ্য ছিল। জ্বিনের আছরসহ বিভিন্ন রোগের চিকিৎসা তিনি করেছিলেন। কিন্তু কোন দিন কারো কাছে এর বিনিময়ে কোন কিছু দাবী করেননি।

<u>জ্বীনদের শিক্ষাদান ও দাওয়াত গ্রহণ:</u>

হযরত ছিরামপুরী সাহেব ক্বিবলাহ (রঃ) এর খেদমতে খালক্বের আরেকটি দৃষ্টান্ত ছিল জ্বীনদের শিক্ষাদান। তিনি অনেক জ্বীনদেরকে ক্বোরআনের শিক্ষা দিয়েছিলেন। সাহেব ক্বিবলার স্ত্রীর কাছ থেকে জানা যায় যে, রাখালগঞ্জ মাদ্রাসায় জনৈক জ্বীন উনার কাছে ক্বোরআন শরীফের শিক্ষা নিয়েছিলেন। সনদপ্রাপ্তির পর বিদায়কালে তিনি তাঁর পরিচয় দিয়ে বলেছিলেন, হুজুর! দাদীর কথা আমি ভুলতে পারব না। মাঝে মধ্যে আমি উনার জন্য হালাল পয়সায় কিছু হাদিয়া পূর্বের ঘরে রেখে যাব। পরে মাঝে মধ্যে সত্যিই পূর্বের ঘরে জিলাপী ইত্যাদি পাওয়া যেত। এমনি অনেক ঘটনার কথা ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে।

আলমপুরের ডাক্তার নজরুল ইসলাম সাহেবের কাছ থেকে জানা যায় যে, একবার জ্বীনদের মধ্য থেকে তাঁর কতিপয় ছাত্র তাঁকে দাওয়াত করেছিলেন। তিনি তাদের এই দাওয়াত কবুল করলেন। সম্মতি পেয়ে জ্বীনরা তাঁকে শুন্যে উড়িয়ে নিয়ে চলল। অনেক দূরে নির্জন প্রান্তরে একটি বৃক্ষের নিচে তাঁকে নামাল। তিনি দেখলেন বৃক্ষটির নিচে সুন্দর একটি বিছানা বিছানো। তিনি সেই বিছানায় বিশ্রাম নিলেন। জ্বীনেরা তাদের সাধ্যমত তাঁর আরাম আয়েশের ব্যবস্থা করল। তারা তাঁর সম্মুখে বিভিন্ন রকমের ফল-মূল উপস্থিত করল। তিনি সেগুলো আহার করলেন। তিন দিন অবস্থান করার পর জ্বীনেরা তাঁকে বাড়িতে পৌছে দিল।

<u>ইনসানিয়্যাত</u>

مروءة (মনুষত্ব) এর বিভিন্ন ব্যাখ্যা রয়েছে:

আল্লামা ইবনে কাছীরের মতে مروءة দ্বারা ব্যক্তিত্ব উদ্দেশ্য। কারো কারো মতে নিজেকে সকল গর্হিত কাজ থেকে মুক্ত রাখার চেষ্টা করাই হচ্ছে مروءة - আবার কারো কারো কারো মতে শোভন অশোভন বাছাই করে চলার নাম مروءة -

ইমাম দারিমী (রহঃ) এর মতে ইনসানিয়্যাতের নিশ্চয়তা পেশা বা কাজ অনুযায়ী হয়ে

থাকে। কারো কারো মতে ইনসানিয়্যাত ধর্মীয় শিষ্টাচারের অন্তর্ভুক্ত একটি অনিবার্য বিষয়।

আল্লামা কামালুদ্দীন দ্বামিরী (রহঃ) ইমাম জাওহারী (রহঃ) এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন যে, مروءة শব্দের অর্থ ইনসানিয়্যাত তথা মনুষত্ব। (হায়াতুল হাইওয়ান)

مروءة শব্দটির ব্যাখ্যা যাই এসেছে, এর সবগুলোই হযরত ছিরামপুরী (রহঃ) এর চরিত্রে বিদ্যমান ছিল। ইনসানিয়্যাত তথা মনুষত্ব ও ব্যক্তিত্ব সদালাপী ও মিষ্টভাষী জনাব ছাহেব ক্বিবলাহর জীবনকে এমন মহিমান্বিত করেছিল যে, যখন কেউ তাঁর সামনে উপস্থিত হত, তখন ইহতেরামের স্বর্গীয় অনুভূতি তাকে আচ্ছন্ন ও বিনম্র করে ফেলত। সে এমন এক অনুভূতি, যা 'ঝরাপাতা ঝর ঝর' নয়, বরং অনেক অনেকদিন পর্যন্ত লোকজনের অন্তরের অন্তঃস্থলে তা জাগরুক থাকত এবং প্রদর্শন করত আলোর পথের দিশা। আর তাঁরই প্রতিচ্ছবি অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হত ঐ সকল সম্মানিত লোকদের চেহারায়, যাঁরা হযরত ছিরামপুরী (রহঃ) এর জীবদ্দশায় তাঁর সাহচর্যের মাধুরীতে নিজেদের করেছিলেন স্নাত। আমি অনেকের সাথে হযরত ছিরামপুরী (রহঃ) কে নিয়ে কথা বলেছি। তাঁরা অনেক কথা বলেছেন। কথা বলার সময় আমি দেখেছি, হযরতের প্রতি তাঁদের এক অভূতপূর্ব আস্থা আর তা'যীমের অবিস্মরণীয় ঔজ্জ্বল্য।

তেলাওয়াতে ক্বোরআন

আল-ক্বোরআনুল কারীমের সবচেয়ে বড় মর্যাদা হল এই যে, ইহা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কালাম। যেমন তিনি বলেছেন, وهذا كتاب أنزلناه مبارك (সুরা আনআম, আয়াত ৯২) অর্থাৎ "এই কোরআন শরীফ হচ্ছে আমার নাযিলকৃত একখানা বরকতময় কিতাব"। অন্য সুরায় তিনি বলেছেন, ان هذا القران يهدي للتي هي أقوم (সুরা ইছরা, আয়াত: ৯) অর্থাৎ "নিঃসন্দেহে এই কোরআন ভারসাম্যপূর্ণ ও সঠিক পথ প্রদর্শন করে"। হযরত উছমান (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসুল (সাঃ) বলেছেন, خيركم من تعلم القرآن وعلمه অর্থাৎ "তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই উত্তম, যে ক্বোরআনে কারীমের শিক্ষা গ্রহণ করে এবং অন্যকে তা শিক্ষা দেয়"।

o হযরত বুরাইদাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বল্লেন যে রাসুল (সাঃ) বলেছেন:

ان القرأن يلقي صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب. فيقول هل تعرفني؟ فيقول ما أعرفك. فيقول أنا صاحبك القران الذي أظمأتك في الهواجر وأ سهرت ليلك وان كل تاجر من وراء تجارته واني لك اليوم من وراء كل تجارة. فيعطي الملك بيمينه والخلد بشماله ويوضع علي رأ سه تاج الوقار. ويكسي والده حلتين لا تقوم لهما الدنيا فيقولان بما كسبنا هذا ؟ يقال بأخذ ولدكما القرأن ثم يقال اقرأ واصعد في درج الجنة وغرفها فهو في صعود ما كان يقرأ. هذا كان حدرا أو ترتيلا.

অর্থাৎ "নিশ্চয়ই ক্বেয়ামতের দিবসে ক্বোরআনে কারীম পাঠকারীর কবর যখন ফেটে যাবে, তখন ক্বোরআন তাঁর সাথে দুর্বল ব্যক্তির ন্যায় সাক্ষাত করবে। তখন সে বলবে, তুমি কি আমাকে চিনতে পেরেছ? সে বলবে, আমি তোমাকে চিনি না। অতঃপর সে বলবে, আমি তোমার সাথী সেই ক্বোরআন, যে দিবসের মধ্যভাগে প্রচন্ড গরমে তোমাকে তৃষ্ণার্ত এবং রাতে বিনিদ্র করে রেখেছিল। আর প্রত্যেক ব্যবসায়ী তার ব্যবসার পেছনে লেগে থাকে।

আজ আমি তোমার জন্য তোমার প্রতিটি ব্যবসার পেছনে আছি। অতঃপর তার ডান হাতে রাজত্ব দেয়া হবে, বাম হাতে দেয়া হবে চিরস্থায়ীত্ব এবং তার মাথায় রাখা হবে সম্মানের টুপি। আর তার পিতা-মাতাকে পরানো হবে এক জোড়া পোশাক, যা দুনিয়া তাদেরকে দিতে পারেনি। অতঃপর তারা বলে উঠবেন, কিসের বিনিময়ে আমরা এটা পরলাম। বলা হবে, তোমাদের সন্তানের ক্বোরআন ধারণের জন্য। অতঃপর তাকে বলা হবে, পড় এবং জান্নাতের রুমে রুমে, স্তরে স্তরে আরোহণ করতে থাক। সুতরাং যতক্ষণ সে পড়তে থাকবে, ততক্ষণ সে আরোহণেই থাকবে। সেটা হোক দ্রুততার সাথে অথবা ধীরে ধীরে"। (দারিমী)

০ হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) এর হাদীছ:

ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله اذ الناس نائمون وبنهاره اذ الناس مفطرون وبحزنه اذ الناس يفرحون وببكائه اذ الناس يضحكون وبصمته اذ الناس يخوضون وبخشوعه اذ الناس يختالون.

অর্থাৎ "ক্বোরআনে কারীমের বহনকারীর উচিৎ, রাতে পবিত্র কোরআনের মাধ্যমে আল্লাহর কাছে পরিচিত হওয়া, যখন মানুষ ঘুমন্ত থাকে এবং দিবসে, যখন মানুষ আহারে নিমগ্ন থাকে, দুঃখ-চিন্তার মাধ্যমে, যখন মানুষ আনন্দে মশগুল থাকে, কান্নার মাধ্যমে, যখন মানুষ হাসতে থাকে, চুপ থাকার মাধ্যমে, যখন মানুষ তামাশা করে এবং বিনয়ের মাধ্যমে, যখন মানুষ গর্ব করে"।

০ হযরত ফুদ্বাইল (রহঃ) বলেন, "ক্বোরআনে কারীমের বহনকারী ব্যক্তি দ্বীন ইসলামের পতাকাবাহীর ন্যায়। সুতরাং অনর্থক কথকের মত তার কথা বলা, ভুলকারীর মত ভুল করা এবং প্রমোদকারীর মত প্রমোদে লিপ্ত হওয়া উচিৎ নয়"।

০ ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহঃ) বলেন:

رأيت رب العزة في المنام فقلت يا رب ما أقرب ما يتقرب به اليك المتقربون؟ فقال بكلامي يا أحمد. فقلت يا رب بفهم أو بغير فهم ؟ فقال بفهم وبغير فهم.

অর্থাৎ "আমি স্বপ্নে রাব্বুল ইজ্জতকে দেখলাম। তখন আমি বললাম, "হে প্রতিপালক! সেই বস্তুটি কী, যার দ্বারা নৈকট্য লাভকারীরা তোমার সর্বাধিক নৈকট্য লাভ করে থাকে"? উত্তরে তিনি বললেন, "হে আহমদ! সেটা আমার কালামের (তেলাওয়াত) দ্বারা"। অতঃপর আমি বললাম, "হে প্রতিপালক! সেটা কি বুঝে, না না বুঝে"? জবাবে তিনি বললেন, "বুঝে এবং না বুঝে উভয়ের দ্বারা আমার বান্দারা আমার সর্বাধিক নৈকট্য লাভ করে থাকে"।

হযরত ছিরামপুরী (রহ:) তেলাওয়াতে কালামে পাকের সাথে সোনা-সোহাগার মত জড়িত ছিলেন। তাই তিনি আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত বুযুর্গদের অন্তর্গত হতে পেরেছিলেন বলে আমাদের বিশ্বাস। আর এ জন্যই তাঁর সহধর্মিনী স্বপ্নে দেখেন যে, তিনি অত্যন্ত সুন্দর লেবাস পরিহিত অবস্থায় বাড়িতে তাশরীফ এনেছেন। তখন তিনি তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি তো মৃত্যুবরণ করেছেন, তাহলে বেড়াচ্ছেন কিভাবে"? উত্তরে তিনি বললেন, "নিষ্ঠার সাথে ক্বোরআন শরীফের খেদমত করার কারণে আমাদের দু'জনকে আল্লাহ পাক ছেড়ে দিয়েছেন"। অন্য জনের নাম বর্ণনাকারিনীর মনে নেই।

হযরত ছিরামপুরী (রহ:) আজীবন অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে ক্বোরআনে কারীমের খেদমত করে গেছেন। তাঁর তেলাওয়াত ছিল এতই মর্মস্পর্শী যে, তাঁর তেলাওয়াতকালে শ্রোতা-

মন্ডলীর বহির্জ্ঞান বিলুপ্ত হয়ে যেত। তাঁর তেলাওয়াতের মধ্যে এমন উচ্চ পর্যায়ের প্রভাব ছিল যে, ছাত্র-অছাত্র যার কানেই তাঁর তেলাওয়াতের আওয়াজ প্রবেশ করত, তার মধ্যে নিজের অজান্তেই তা প্রভাব ফেলে বসত। তাই কথিত আছে যে, সে যুগের গরু রাখালদের মধ্যে যারা তাঁর তেলাওয়াতের আওয়াজের আওতায় পড়ত, তারা বিশুদ্ধভাবে ক্বোরআনে কারীমের তেলাওয়াত করতে পারত। মাদ্রাসার আশে পাশের মহিলারাও ক্বারী ছাহেবগণের ন্যায় বিশুদ্ধ তেলাওয়াতের অধিকারিনী হয়ে গিয়েছিলেন বলে লোক মুখে শুনা যায়। এমন মহান ব্যক্তির তেলাওয়াতের এই সুখ্যাতি শুনে জায়ফরপুর নিবাসী তৎকালীন দেওবন্দী শীর্ষ আলিম হযরত মাওলানা নুরুল মুত্তাক্বীন (রহঃ) তাঁকে একদিন বাড়ি যাবার পথে পথরোধ করে বললেন, আল্লাহ আপনাকে যে নেয়ামত দান করেছেন, তা থেকে আমাদেরকে উপকৃত হওয়ার সুযোগ দিন। প্রতি সপ্তাহে বাড়ি যাবার পথে অন্তত: একটি ঘন্টা হলেও আমাদেরকে মশক্ব দিয়ে যাবার অনুরোধ করছি। আমরা কয়েকজন আলিম ঐ দিন আপনার অপেক্ষায় বসে থাকব। যেহেতু ছিরামপুরী ছাহেব (রহ:) এই খেদমতের জন্যই এই ধরণীতে আগমন করেছিলেন, তাই তিনি সাদরে তাঁদের প্রস্তাব গ্রহণ করলেন। প্রথম দিন মশক্ব দেয়ার পর মাওলানা জায়ফরপুরী ছাহেব বলেছিলেন, "আপনার তেলাওয়াত শুনে আমার মনে হল, যেন এই মাত্র আয়াতগুলো আসমান থেকে নাযিল হচ্ছে। আল্লাহ প্রদত্ত এই নেয়ামত নিয়ে আপনি বসে থাকবেন না, কষ্ট করে হলেও তা সমাজে ছড়াতে থাকুন- এই আমাদের আকুল আবেদন"। হযরত ছিরামপুরী (রহ:) তাঁর সারাটি জীবন পবিত্র ক্বোরআনুল করীমের খেদমতে ব্যয় করে গেছেন।

বর্ণিত আছে যে, হযরত ছিরামপুরী ছাহেব (রহ:) তাঁর বড় ছাহেবজাদার খোঁজ খবর নিতে মাঝে মধ্যে সিলেট জেলার অন্যতম বিদ্যাপীঠ সৎপুর দারুল হাদীছ কামিল মাদ্রাসায় যেতেন। তখন উক্ত মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা ও প্রিন্সিপাল আল্লামা গোলাম হুসাইন ছাহেবের উদ্যোগে তেলাওয়াতের মাহফিল ক্বায়েম হত এবং তাঁরা হযরত ছিরামপুরী ছাহেব (রহ:) এর তেলাওয়াত শুনে তৃপ্ত হতেন।

ক্বারীউল ক্বোরআনের দেহ ক্বরের মাটি ভক্ষণ করে না

ক্বোরআনে কারীমের পাঠকারীকে ক্বরের মাটি কখনো ভক্ষণ করে না। তবে শর্ত এই যে, তেলাওয়াতকারীকে প্রতিদানের আশা ত্যাগ করতে হবে এবং তাকে ক্বোরআনে বর্ণিত বিধি বিধানের উপর আমল করতে হবে।

০ হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রা:) এর হাদীছ:

اذا مات حامل القرآن اوحي الله الي الأرض الا تأكل لحمه؟ فتقول الأرض: أي رب وكيف أكل لحمه وكلامك في جوفه .

অর্থাৎ, "যখন ক্বোরআনে কারীমের বহনকারী কোন লোক মৃত্যুবরণ করে, তখন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যমীনের প্রতি ওহী প্রেরণ করেন যে, তুমি কি তার গোশত ভক্ষণ করবে না? তখন যমীন বলে, হে প্রতিপালক! কিভাবে আমি তার গোশত ভক্ষণ করব, তোমার বাণী যে তার পেটের মধ্যে রক্ষিত"?

হযরত ছিরামপুরী (রহ:) একজন প্রখ্যাত তাজবীদ বিশারদ, অভিজ্ঞ ও নিষ্ঠাবান কারিউল কোরআন এবং খাঁটি আশিকে কোরআন ছিলেন। তাঁর নিষ্ঠা ও এশকের চিহ্ন তিলাওয়াতের সময় তাঁর মুখাবয়বে প্রকাশ পেত। তাই তিনি ক্বর দেশে অক্ষত শরীরে

বিদ্যমান আছেন বলে আমাদের বিশ্বাস।

<u>সুন্দর স্বর</u>

পবিত্র ক্বোরআনে কারীমকে সাধ্যমত সুন্দর স্বরে তেলাওয়াত করা উচিৎ। এটা মুসতাহাব। রাসুল (সাঃ) বলেছেন- من لم يتغن القرآن فليس مني অর্থাৎ " যে ব্যক্তি ক্বোরআনে কারীমকে সুন্দররূপে পাঠ করল না, সে আমার দলভুক্ত নয়"। এখানে تغني দ্বারা تحسين القرآن উদ্দেশ্য।

হযরত ছিরামপুরী (রহ:) অত্যন্ত সুন্দর স্বরে সুন্দররূপে পবিত্র কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করতেন। তাঁর সুন্দর তিলাওয়াতে মুগ্ধ হয়েই দেশবরেণ্য সূফী সাধক আল্লামা হযরত আব্বাস আলী (রহ:) তাঁর জামাতা বানিয়ে তাঁকে গৌরবময় করেছিলেন। তাই ছিরামপুরী সাহেব (রহ:) এ দিক থেকেও বিশেষ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন।

<u>আয়াতের পুনরাবৃত্তি</u>

ক্বোরআনে কারীমের তেলাওয়াতের সময় তেলাওয়াতকারীর দৃষ্টি দেয়া উচিৎ যে, কীভাবে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ক্বোরআনে কারীমের অর্থসমূহকে মানুষের অনুধাবন শক্তির নিকট সহজবোধ্য করে দিয়েছেন এবং সেটাও তেলাওয়াতকারীর জানা উচিৎ যে, তিনি যা তেলাওয়াত করছেন, তা কোন মানবের বাণী নয়। আরও উচিৎ, ক্বোরআনে কারীমের মাহাত্ম্য সম্পর্কে চিন্তা করা। যদি তা সম্ভব না হয়, তবে উচিৎ, তেলাওয়াতকৃত আয়াতের পুনরাবৃত্তি করা।

০ হযরত আবু যার (রা:) এর একটি হাদীছ:

عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه قام ليلة بأية يرددها (ان تعذبهم فانهم عبادك) وقام تميم الداري (رض) بأية وهي قوله تعالي (أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين أمنوا وعملوا الصالحات) وكذالك قام بها الربيع بن خيثم رحمة الله عليه ليلة.

অর্থাৎ "হযরত নবী করীম (সা:) এক রাত্রিতে কিয়ামুললাইল আদায়কালে একটি আয়াত পড়লেন এবং বার বার সেটা আওড়াচ্ছিলেন। (সে আয়াতটি ছিল) ان تعذبهم فانهم عبادك হযরত তামীম দারী (রাঃ) অন্য একটি আয়াতকে এমনিভাবে বার বার পাঠ করছিলেন, তা হল, ام حسب الذين اجترحوا السيئات الأية- এমনিভাবে ঐ আয়াতটি হযরত রবী' বিন খায়সাম (রহঃ)ও এক রাত্রিতে বার বার পড়েছিলেন"।

হযরত ছিরামপুরী ছাহেব (রহঃ) পবিত্র ক্বোরআন শরীফের একজন নিখাদ আশিক্ব হিসেবে তেলাওয়াতের সময় সম্ভাব্য সকল বিষয়ে সমধিক গুরুত্বারোপ করতেন। তিনি আল্লাহ প্রদত্ত অত্যন্ত সুন্দর স্বরের অধিকারী ছিলেন। আত্মার মাধুরী এবং স্বরের সুষমা মিলে যে তিলাওয়াত তাঁর যবান থেকে বের হত, তা সত্যিই অপরূপ লাগত এবং শ্রোতাদের মন কাড়ত।

<u>ধৈর্য ও সহনশীলতা</u>

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ক্বোরআনে কারীমের ৯০ স্থানে ধৈর্যের কথা উল্লেখ করেছেন। যেমন একস্থানে তিনি বলেছেন, وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا (সূরা আস সিজদাহ আয়াত: ২৪) অর্থাৎ "আমি তাদের মধ্যে ধর্ম পালন ও দ্বীনের শত্রু থেকে আগত

অত্যাচার, উৎপীড়ন ও বিপদ আপদের উপর ধৈর্য ধারণের কারণে কিছু সংখ্যক মানুষকে নেতৃত্বের আসনে আসীন করেছি, যারা লোকজনকে আমার নির্দেশিত পথ প্রদর্শন করবে"। অন্য এক আয়াতে তিনি বলেছেন, وتمت كلمة ربك الحسنى على بنى اسرائيل بماصبروا অর্থাৎ "ধৈর্য ধারণের ফলস্বরূপ বনী ইসরাঈলের উপর তোমার প্রতিপালকের কৃত সবগুলো উত্তম অঙ্গীকার পূরণ করে দেয়া হল"।

অন্য আয়াতে তিনি বলেছেন, انما يوفي الصابرون أجرهم بغير حساب (সূরা যুমার আয়াত:১০) অর্থাৎ " ধৈর্য ধারণকারীদেরকে বেহিসাব ছওয়াব দান করা হবে"।
হাদীছ শরীফে বর্ণিত আছে: عن النبي صلي الله عليه وسلم انه قال ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر (بخاري ومسلم) অর্থাৎ নবী করীম (সা:) বলেছেন, "কাউকে ধৈর্য অপেক্ষা অধিক উত্তম ও অধিক প্রশস্ত কোন কিছু দান করা হয়নি"।

অন্য একটি হাদীছে এসেছে, الصبر من الايمان بمنزلة الرأس من الجسد অর্থাৎ, "ঈমানের ক্ষেত্রে ধৈর্য তেমন, শরীরের ক্ষেত্রে মস্তক যেমন"।

হযরত **হাসান বসরী (রহঃ) বলেছেন:**

الصبر كنز من كنوز الخير لا يعطيه الله الا لعبد كريم عنده . অর্থাৎ, "ধৈর্য সর্বোত্তম ভান্ডারসমূহের একটি, যা আল্লাহ রাব্বুল আলামীন একমাত্র ঐ ব্যক্তিকেই দান করেন, যে তার কাছে সম্মানিত"।

ইতিহাস থেকে জানা যায়:

কতিপয় মুয়াররিফীন বিল্লাহ সব সময় তাদের পকেটে এক টুকরো কাগজ রাখতেন এবং সময় সময় সেই টুকরোটি বের করে পড়তেন, তাতে লিখা ছিল, واصبر لحكم ربك فانك باعيننا অর্থাৎ "তুমি তোমার প্রতিপালকের আদেশ পালনে ধৈর্য ধারণ কর। কেননা তুমি আমার দৃষ্টিসীমায় রয়েছ"।

<u>জ্ঞাতব্য,</u>

ধৈর্য ধারণ করা হচ্ছে মানুষেরই বৈশিষ্ট্য। পশুর ক্ষেত্রে এটা অকল্পনীয়। কারণ তাদের মধ্যে نقصان রয়েছে। আবার ফেরেশতাদের ক্ষেত্রেও ইহা অকল্পণীয়। কারণ তাদের মধ্যে كمال রয়েছে। তাদের ধৈর্য্য ধারণের কোন প্রয়োজন নেই। আর মানুষকে তার শৈশবকাল থেকেই সৃষ্টি করা হয় পশুর ন্যায় অপূর্ণতা দিয়ে। শৈশব থেকেই মানুষের মধ্যে সৃষ্টি করা হয় খাবারের প্রতি লোভ। অতঃপর তার মধ্যে প্রকাশ পায় খেলাধুলা এবং সৌন্দর্যের প্রতি আকর্ষণ, অতঃপর বিয়ের প্রতি আকর্ষণ। অথচ এমতাবস্থায় তার মধ্যে ধৈর্য ধারণের ক্ষমতা নেই।

তারপর আকল যখন তরান্বিত ও শক্তিশালী হয়, ভাল-মন্দ বিচারের বয়স আসে, তখন হেদায়াতের আলো প্রকাশিত হয় এবং সেটা স্তরে স্তরে বালেগ হবার বয়স পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। যেভাবে ভোরের আলো সূর্য উদিত হবার আগ পর্যন্ত প্রকাশ পেয়ে থাকে। কিন্তু কথা হল সেই হেদায়াতের আলো তখন অপূর্ণাঙ্গ থাকে, যা একজন মানুষকে পরকালের কল্যাণের দিকে পরিচালিত করার ক্ষেত্রে مرشد হতে পারে না। অতঃপর শরীয়তের বন্ধনে যখন সে আবদ্ধ হয়, তখন সেই হেদায়াতের আলো পরকালীন বিষয়াদির প্রতি পূর্ণ দৃষ্টিপাত দেয় এবং তখন মানুষের প্রতিরোধ ক্ষমতাও বৃদ্ধি পায়। তবে হ্যাঁ, মানুষের স্বভাবই এমন

যে, প্রিয় বস্তুর প্রতি চাহিদা থেকেই থাকে। তখন আক্বল ও শরীয়তের বিধি-বিধান সেখানে বাঁধা প্রদান করে। তখন এ দু'য়ের মধ্যে শুরু হয় দ্বন্দ্ব। আর এ যুদ্ধের ময়দান হয় মানুষের ক্বলব। আর ধৈর্যই তখন কুপ্রবৃত্তির মোকাবেলায় দ্বীন প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে ভূমিকা পালন করে থাকে। অতঃপর যখন ধৈর্য বিজয় লাভ করে, আর কুপ্রবৃত্তি পরাজিত হয়, মানুষ তখন ধৈর্যশীলদের অন্তর্ভূক্ত হয়। আর ধৈর্য যখন দুর্বল হয়, তখন কুপ্রবৃত্তি মাথাচাড়া দিয়ে উঠে, মানুষ তা দমন করতে ধৈর্যের পরিচয় দিতে পারে না। আর এ ক্ষেত্রে মানুষ শয়তানের উত্তরসুরীদের মধ্যেই গণ্য হয়। আর যখন এই বিষয়টি সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ পেল যে, কুপ্রবৃত্তি দমনে এবং দ্বীন প্রতিষ্ঠায় ধৈর্যের গুরুত্ব অপরিসীম, তখন ঐ বিষয়টিও প্রমাণিত হয়ে গেল যে, ধৈর্য মানব সম্প্রদায়ের একটি বিশেষ গুণ।

ধৈর্যের রয়েছে কতিপয় শিষ্টাচার

ধৈর্যের ক্ষেত্রে কতিপয় করণীয় বিষয়াদি রয়েছে:

এক. বিপদের প্রথম ধাককাতেই ধৈর্য ধারণ করতে হবে। কেননা রাসুলে কারীম সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন- انما الصبر عند الصدمة الاولي অর্থাৎ নিশ্চয়ই ধৈর্য হচ্ছে প্রথম ধাককায়।

দুই. বিপদের মধ্যে استرجاع করা, যা মুসলিম শরীফে বর্ণিত হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) এর হাদীছে আলোকপাত করা হয়েছে।

তিন: বিপদের সময় জিহবাসহ অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে নীরব রাখা। তবে কান্না বৈধ। কেননা কান্না আল্লাহর করুণার দৃষ্টি বান্দার দিকে ধাবিত করে।

চার: বিপদগ্রস্ত লোকের চেহারায় বিপদের কোন লক্ষণ প্রকাশ না পাওয়া। যেমনটা প্রকাশ পেয়েছিল হযরত উম্মে সুলাইমের চেহারায়, যখন তাঁর ছেলে মারা যান। সহীহ মুসলিম শরীফে বর্ণিত হাদীছটি প্রসিদ্ধ।

আরেকটি জ্বলন্ত উদাহরণ

হযরত ছাবিত আল বানানী (রহঃ) উল্লেখ করেছেন, যখন হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাতুরাফ ইন্তেক্বাল করেন, তখন মাতুরাফ তাঁর গোত্রের লোকজনের সম্মুখে মাথায় তেল মেখে, সুন্দর কাপড় পরিধান করে এবং সুগন্ধি ব্যবহার করে উপস্থিত হলেন। ক্বওমের লোকেরা খুবই রাগান্বিত হল। তারা বলল, ছেলে ইনতেক্বাল করেছেন, আর আপনি মাথায় তৈল ব্যবহার করছেন? তিনি জবাব দিলেন, আমার প্রতিপালক আমার সাথে তিনটি বিষয়ের ওয়াদা করেছেন, সে তিনটি বিষয়ের প্রত্যেকটি আমার কাছে এই দুনিয়া ও তার ধারণকৃত সকল বিষয়াদির চেয়ে উত্তম। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেছেন -

الذين اذا أصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون. اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. (সুরা বাক্বারা, আয়াত:১৫৮)

অর্থাৎ "ধৈর্যশীল তাঁরাই, যাঁরা বিপদ-আপদে আক্রান্ত হলে বলে যে, আমরা আল্লারই এবং আমরা তাঁর কাছেই প্রত্যাবর্তিত হব। এঁদের উপরই তাঁদের প্রতিপালকের নিকট থেকে অফুরন্ত অনুগ্রহ ও রহমত রয়েছে। আর এঁরাই হেদায়াতপ্রাপ্ত"।

বিপদে ফেরেশ্তার আগমন

বান্দাহ যখন রোগগ্রস্ত হয়, তখন আল্লাহ রব্বুল আলামীন দু'জন ফেরেশ্তা পর্যবেক্ষণের জন্য প্রেরণ করেন। যেমন হাদীছে এসেছে:

عن أبي هريرة رض عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه قال اذا مرض العبد بعث الله اليه ملكين فيقول أنظروا ما يقوله لعواده؟ فان هو حمد الله تعالي اذا دخلوا عليه فيقول لعبدي ان انا توفيته أن أدخله الجنة وان انا شفيته أن أبدله لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه وان اكفر عنه خطاياه (الموطا)

অর্থাৎ "হযরত আবু হুরায়রাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসুলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যখন বান্দাহ অসুস্থ হয়, তখন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তার কাছে দ'জন ফেরেশতা প্রেরণ করেন। অতঃপর তিনি বলেন, দেখ, সে তাকে দেখতে আসা লোকজনকে কী বলে? তারা ঘরে প্রবেশ করলে যদি সে আল্লাহর প্রশংসা করে, তবে আল্লাহ বলেন, আমার বান্দার হুকুম, যদি আমি তার মৃত্যু ঘটাই, তবে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাব। আর যদি তাকে রোগ থেকে মুক্তি দিয়ে দেই, তবে তার গোশতকে উত্তম গোশতে, তার রক্তকে উত্তম রক্তে পরিবর্তন করে দেব এবং তার সকল ভূল-ত্রুটি ক্ষমা করে দেব"। (মুয়াত্তা) সুবহানাল্লাহ!

<u>যন্ত্রনার প্রকাশ না ঘটানো</u>

মানুষ দুঃখ-কষ্টে জর্জরিত হলেও তা সবার কাছে প্রকাশ না করা উত্তম। হাদীছেও সে রকম বলা হয়েছে। যেমন- قال علي رضي الله تعالي عنه لا تشكو وجعك ولا تذكر مصيبتك. অর্থাৎ, হযরত আলী (রাঃ) বলেন, "তুমি তোমার দুঃখ-যাতনার কোন অভিযোগ করো না এবং তোমার বিপদ নিয়ে কোন আলোচনা করো না"।

আহনাফ (রহঃ) বলেন,

لقد ذهبت عيني منذ أربعين سنة ما ذكرتها لاحد অর্থাৎ "আমি চল্লিশ বৎসর যাবত চক্ষু হারিয়েছি, কিন্তু আমি তা কারো কাছে প্রকাশ করিনি"।

হযরত শাক্বীক বলখী (রহঃ) বলেন:

من شكا مصيبة به الي غير الله لم يجد في قلبه لطاعته حلاوة أبدا

অর্থাৎ, "যে ব্যক্তি আল্লাহ পাক ছাড়া অন্যের কাছে তার বিপদের অভিযোগ করল, সে তার ক্বলবের মধ্যে আল্লাহর আনুগত্যের কোন স্বাদ পাবে না"।

জনৈক কবি বলেছেন:

اصبر لكل مصيبة وتجلد
واعلم بأن المرأ غير مخلد
বিপদে হও তুমি সহনশীল আর অবিচল,
জেনে রেখ, রইবে না চিরকাল মানবের দল।

<u>বিপদে নবী (সঃ) কে স্মরণ</u>

গুণীজনেরা বলেছেন, "যখন তোমাদের কারো সামনে বিপদ আসে, তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর আরোপিত ভয়ানক সকল বিপদ আপদের কথা স্মরণ কর, নিজের কষ্ট লাঘব হবে"।

কোন এক কবি তাই বলেছিলেন: واذا ذكرت مصيبة
فاذكر مصابك بالنبي محمد
বিপদ যবে তুমি করিবে স্মরণ,
মুহাম্মদ নবীকে তখন করিও স্মরণ।

ধৈর্যের পুরষ্কার

ক. উত্তম প্রতিদান

হাদীস শরীফে এসেছে-

عن أم سلمة رض ان رسول الله ص قال من أصابته مصيبة فقال كما أمر الله تعالى ''انا لله وانا اليه راجعون'' اللهم اجرني في مصيبتي وأعقبني خيرا منها الا فعل الله تعالي ذالك به . (الموطا)

অর্থাৎ "হযরত উম্মে সালামাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসুলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কেউ যখন বিপদগ্রস্থ হয়, অতঃপর যেভাবে আল্লাহ পাক তাকে নির্দেশ দিয়েছেন সেভাবে সে বলে, "ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন", অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমাকে আমার মুসিবতের ক্ষেত্রে উত্তম প্রতিদান দান কর এবং এর চেয়েও উত্তম কোন পরিণাম আমাকে দান কর, তবে আল্লাহ পাক তাই করবেন" । (মুয়াত্তা)

খ. ক্ষমা ঘোষণা

হাদীস শরীফে এসেছে-

عن ابن عباس رض قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم من أصيب في ماله أو في نفسه فكتمها ولم يشكها الي الناس كان حقا علي الله أن يغفر له . رواه الطبراني

অর্থাৎ, "হযরত ইবনে আব্বাছ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি তার সম্পদের ক্ষেত্রে অথবা তার নিজের ক্ষেত্রে বিপদে পতিত হল, অতঃপর সে তা গোপন করল এবং মানুষের কাছে এ নিয়ে কোন অভিযোগ করল না, তাকে ক্ষমা করা আল্লাহর উপর অত্যাবশ্যকীয় হয়ে যায়"। (তিবরানী) সুবহানাল্লাহ!

গ. বেহেশতে ঘর নির্মাণ

হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে-

عن ابي موسي الأشعري (رض) عن رسول الله صلي الله عليه وسلم أنه قال اذا مات ولد العبد قال الله لملائكته قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون نعم. فيقول هل قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون نعم. فيقول ماذا قال عبدي؟ فيقولون حمدك وا سترجع فيقول ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموا ه بيت الحمد. (ترمذي)

অর্থাৎ, "হযরত আবু মূসা আশআরী (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, জনাব রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যখন বান্দার সন্তান মৃত্যুবরণ করে, আল্লাহ ফেরেশতাদেরকে বলেন, তোমরা কি আমার বান্দার সন্তানের রূহ কবজ করলে? তখন তারা বলবে, হ্যাঁ। অতঃপর তিনি বলবেন, আমার বান্দাহ কী বলল? তখন তারা বলবে, সে আপনার প্রশংসা করেছে এবং (সকল দাবী) প্রত্যাহার করে নিয়েছে। তখন তিনি বলবেন, তোমরা আমার বান্দাহর জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ কর এবং তার নাম রাখ "বাইতুল হামদ" বা প্রশংসার ঘর"।

ধৈর্য ধারণে হযরত ছিরামপুরী ছাহেব (রহঃ)

দীর্ঘদিন ধরে হযরত ছিরামপুরী ছাহেব (রহঃ) প্যারালাইসিস রোগে আক্রান্ত ছিলেন। তাঁর পরিবারবর্গদের কাছ থেকে জানা যায় যে, এত বিপদের সময়ও কোন দিন তিনি কারো

কাছে তাঁর রোগ সম্পর্কে কোন অভিযোগ করেননি। তাঁর চেহারা দেখলে মনে হত না যে, তিনি এত কঠিন এক রোগে আক্রান্ত। অনেক লোকজন তাঁকে দেখার জন্য আসতেন এবং তার কুশলাদি জিজ্ঞাসা করতেন। তিনিও আল্লাহর প্রশংসা জ্ঞাপন করতঃ তাঁর সন্তুষ্টির কথা বলতেন। তিনি তাঁর এই নাজুক পরিস্থিতিকে একটি পরীক্ষা হিসেবেই হয়ত গ্রহণ করেছিলেন এবং সে পরীক্ষায় সফল হবার আপ্রাণ চেষ্টাও করেছিলেন। তাই তিনি এত অসহায়ত্বের শিকার হয়েও কোন দিন কারো কাছে অসন্তোষ প্রকাশ করেননি। আমরা মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছে প্রার্থনা করি, এ মহান বান্দাহকে যেন তিনি উত্তম পুরস্কার দান করেন, যেমনটি তিনি তাঁর পাক কালাম শরীফে বলেছেন- انما يوفي الصابرون أجرهم بغير حساب (سورة النحل) অর্থাৎ "আল্লাহ পাক বলেন, নিশ্চয়ই কিয়ামত দিবসে ধৈর্যশীলদেরকে অগণিত পরিপূর্ণ প্রতিদান দেয়া হবে। (সুরাআন নাহল, আয়াত: ৯৬)

হালাল জীবিকা

ক্বোরআন যা বলে:

জীবিকা অন্বেষণে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেছেন:

ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم (البقرة) অর্থাৎ "তোমাদের প্রতিপালকের কাছ থেকে অনুগ্রহ (হালাল জীবিকা) অন্বেষণে তোমাদের কোন বাঁধা নেই"। (বাক্বারা, আয়াত: ১৯৮)

হাদীছ যা বলে:

রাসুলে কারীম (সা:) বলেছেন, طلب الحلال جهاد অর্থাৎ, "হালাল (জীবিকা) অন্বেষণ করা হচ্ছে জিহাদ"।(মসনদে শিহাব)

রাসুলে কারীম (সা:) আরও বলেছেন, ان الله ليحب العبد المحترف অর্থাৎ, "নিশ্চয়ই আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পেশাজীবী বান্দাহকে ভালবাসেন"। (ত্বিবরানী)

সহীহ বুখারীতে আছে -

ان النبي صلي الله عليه وسلم قال ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده وان نبي الله داود كان يأكل من عمل يده.

অর্থাৎ, "নিশ্চয়ই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কোন ব্যক্তি নিজ হাতের কাজ দ্বারা অর্জিত খাবার থেকে উত্তম খাবার কখনো খেতে পারে না। আর নিশ্চয়ই আল্লাহর নবী দাউদ (আ:) নিজ হাতের কাজ দ্বারা অর্জিত খাবারই খেতেন"।

অন্য একটি হাদীছে এসেছে -

ان زكريا عليه السلام كان نجارا. অর্থাৎ নিশ্চয়ই যাকারিয়া আলাইহিস্‌সালাম কাঠমিস্ত্রী ছিলেন"। দেখা যাচ্ছে, তিনি নিজ হাতে কাজ করে খেতেন।

হযরত ইবনে আব্বাছ (রাঃ) বলেন:

كان أدم عليه السلام حراثا ونوح نجارا وادريس خياطا وابراهيم ولوط زراعين وصالح تاجرا وداؤد زرادا وموسي وشعيب ومحمد صلوات الله تعالي عليهم رعاة.

অর্থাৎ "হযরত আদাম আলাইহিস সালাম চাষী, হযরত নূহ আলাইহিস সালাম কাঠ মিস্ত্রী, হযরত ইদ্রীছ আলাইহিস সালাম দর্জি, হযরত দাউদ আলাইহিসসালাম বর্ম প্রস্তুতকারী এবং

হযরত মুসা আলাইহিস সালাম, শুয়াইব আলাইহিস সালাম এবং মুহাম্মাদ আলাইহিস্ সালাম রাখাল ছিলেন"।

হযরত লুকমান আলাইহিস সালাম তাঁর ছেলেকে উপদেশ দিয়েছিলেন:

يا ابني ! ستعن بالكسب الحلال . فانه ما افتقر احد قط الا اصابه ثلاث خصال : رقة في دينه , وضعف في عقله , وذهاب مروءته .

অর্থাৎ, "হে বৎস! হালাল রুজির দ্বারা আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা কর। কেননা কোন ব্যক্তি দরিদ্র হলে তিনটি বৈশিষ্ট্য তাকে চেপে ধরে- তার ধর্মে আনে নম্রতা, তার জ্ঞানে আনে দুর্বলতা, এবং চলে যায় তার মানবতা"।

হযরত ছিরামপুরী ছাহেব (রহঃ) হালাল রুজির ক্ষেত্রে খুবই হুশিয়ার ছিলেন। এটা ছিল তার খোদাভীরুতার অন্যতম এক পরিচয়। ইমাম ছাহেব হিসেবে যা বেতন পেতেন, তা ই ছিল তাঁর জীবন যাপনের অবলম্বন। قناعت তথা অল্পে তুষ্টির বৈশিষ্ট্য ছিল তাঁর মজ্জাগত। আখেরাতের ভয়ে তিনি থাকতেন সদা সন্ত্রস্ত। তাই পার্থিব লোভ-লালসা তাকে কোন দিন জয় করতে পারেনি। তিনি বলতেন, এই পৃথিবী মানুষের চিরস্থায়ী আবাসস্থল নয়, বরং চিরস্থায়ী আবাসস্থল তৈরীর নিমিত্তে মানুষ এই পৃথিবীতে এসেছে। এখান থেকে মানুষকে নেক আমল দ্বারা নিজ চিরস্থায়ী আবাসভূমি খরিদ করে তা নিজ নামে রেজিষ্ট্রি তথা নিবন্ধন করতে হবে, উত্তম আমল দ্বারা তথায় দালান-কোঠা তৈরী করতে হবে এবং আরাম-আয়েশের যাবতীয় উপকরণের ব্যবস্থা করতে হবে। আর এটা তো সর্বজন বিদিত যে, যে ব্যক্তি এই মানসিকতা অর্জন করতে পেরেছেন, তাঁর কোন দিন হারাম রুজির কোন প্রয়োজন পড়বে না।

<u>কিয়ামুল লাইল</u>

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেছেন, (السجدة) تتجافى جنوبهم عن المضاجع অর্থাৎ "তারা রাতে বিছানা থেকে পৃথক থাকে"।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন-

عليكم بقيام الليل فانه دأب الصالحين قبلكم وهو قربة الي ربكم ومغفرة للسيئات ومنهاة عن الاثم . অর্থাৎ "রাত্রি জাগরণ (তাহাজ্জুদের নামায) তোমাদের উপর কর্তব্য। কেননা এটা তোমাদের পূর্ববর্তী সৎকর্মশীলদের অভ্যাস এবং তোমাদের প্রতিপালকের প্রতি নৈকট্য লাভের এবং মন্দ কাজের ক্ষমা এবং পাপ থেকে বেঁচে থাকার সর্বশেষ উপায়স্বরূপ"।

হযরত হাসান বসরী (রাঃ) বলেন-

لم أجد من العبادة شيئا أ شد من الصلاة في جوف الليل , فقيل له ما بال المتهجدين أحسن الناس وجوها ؟ فقال لأنهم خلوا بالرحمن فالبسهم من نوره .

অর্থাৎ, "ইবাদতের ক্ষেত্রে গভীর রাতের সালাত অপেক্ষা অধিকতর কঠিন কিছু আমি পাইনি। অতঃপর তাকে বলা হলো, তাহাজ্জুদ আদায়কারীদের অবস্থা এরকম কেন যে, তাদের চেহারা মানুষদের মধ্যে অধিকতর সুন্দর? জবাবে তিনি বললেন, এটা এই জন্য যে, তারা আল্লাহর সাথে নির্জনে সাক্ষাত করে থাকে। তাই আল্লাহ পাক তাদেরকে তার নুরের পোষাক পরিয়ে দেন"।

মুত্তাক্বীগণের মতে তাহাজ্জুদ আদায় করার ক্ষেত্রে কতিপয় প্রস্তুতি নেয়া উচিৎ। এগুলোকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে। যথা -

ক. বাহ্যিক। খ. আভ্যন্তরীন।

ক. <u>বাহ্যিক:</u>

০ অধিক ভক্ষণ না করা। কারণ সুফী দরবেশগণ বলেছেন -

يا معشر المريدين ، لا تأكلوا كثيرا فتشربوا كثيرا فتناموا كثيرا فتخسروا كثيرا

অর্থাৎ "হে মুরীদগণ! তোমরা অধিক ভক্ষণ করো না। এতে তোমরা অধিক পান করবে, আর অধিক পান করলে তোমরা অধিক ঘুমাবে, ফলে তোমরা অধিকতর ক্ষতিগ্রস্ত হবে"।

০ দিনের বেলায় কঠিন কাজ করে নিজেকে কষ্ট না দেয়া।

০ দিনের বেলায় দুপুরের নিদ্রা ত্যাগ না করা। কারণ এটা তাহাজ্জুদের ক্ষেত্রে আমিলকে সহায়তা করে থাকে।

০ পাপ থেকে বেঁচে থাকা।

হযরত ছুফিয়ান ছওরী (রহঃ) বলেন:

حرمت قيام الليل خمسة أ شهر بذنب أذنبته অর্থাৎ "আমি শুধুমাত্র একটি গোনাহের কারণে ক্বিয়ামুল লাইল থেকে পাঁচ মাস বঞ্চিত ছিলাম"।

খ. <u>আভ্যন্তরীণ প্রস্তুতি:</u>

০ ক্বলবের নিরাপত্তার ব্যবস্থাকরণ:

(ক) পার্থিব চাকচিক্য থেকে বিমুখ হওয়া। (খ) স্বল্প প্রত্যাশায় অভ্যস্ত হওয়া।

(গ) ক্বিয়ামুল লাইলের মর্যাদা সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া।

সহীহ মুসলিম শরীফে আছে -

عن النبى صلى الله عليه وسلم قال ان فى الليل لساعة لا يوافقها عبد مسلم يسئل الله خيرا الا اتاه اياه . وذالك كل ليلة .

অর্থাৎ নবী করীম (সঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, "অবশ্যই রাতে একটি মুহূর্ত রয়েছে, যার সাথে সঙ্গতি রেখে কোন মুসলিম বান্দাহ আল্লাহর কাছে উত্তম কোন কিছুর প্রার্থনা করলে তিনি তাকেই তা দান করেন"।

<u>রাত্রি জাগরণের স্তরসমূহ:</u>

এক: সমস্ত রাত্রি জাগরণ। যেমনটি একদল মুত্তাকীদের অভিমত।

দুই: অর্ধ রাত্রি জাগরণ।

তিন: রাতের এক তৃতীয়াংশ বিনিদ্র যাপন। এ ক্ষেত্রে উচিৎ হবে, রাতের প্রথম অর্ধাংশ ঘুমিয়ে কাটানো এবং শেষ ষষ্টাংশও, যেমনটি হযরত দাউদ (আঃ) করতেন।

সহীহাইনে' বর্ণিত আছে:

احب الصلاة الي الله تعالي صلاة داود عليه السلام كان ينام نصف الليل ويقوم ثلاثة وينام سدسة অর্থাৎ "আল্লাহর কাছে সর্বাধিক প্রিয় সালাত হচ্ছে দাউদ (আঃ) এর সালাত। তিনি অর্ধেক রাত্রি ঘুমাতেন, এক তৃতীয়াংশ জাগতেন এবং এক ষষ্টাংশ ঘুমাতেন"।

চার : এক ষষ্টাংশ অথবা এক পঞ্চমাংশ বিনিদ্র যাপন করা। কেউ কেউ বলেছেন, শেষ ষষ্টাংশই উত্তম।

পাঁচ:কোন ধরনের পরিমাণ নির্ধারন না করা। কেননা এটা অত্যন্ত কঠিন কাজ। এক্ষেত্রে

দু'টি পথ থাকতে পারে -

(ক) রাতের প্রথম দিকে জেগে থাকা, অতঃপর ঘুম আসলে ঘুমিয়ে পড়া। তারপর যখন ঘুম ভাঙ্গবে তখন উঠে পড়া, আবার ঘুমের প্রাবল্য দেখা দিলে ঘুমিয়ে পড়া।

হযরত আনাস (রাঃ) এর হাদীস:

ما كنا نشاء أن نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم مصليا من الليل الا رأيناه وما كنا نشاء أن نراه نائما الا رأيناه .

অর্থাৎ "আমরা যখনই রাসূলে কারীম (সঃ) কে রাত্রিতে নামাযরত অবস্থায় দেখতে চাইতাম তখনই তাঁকে এমতাবস্থায় দেখতে পেতাম। আর আমরা যখনই তাঁকে ঘুমন্ত অবস্থায় দেখতে চাইতাম তখনই তাঁকে এমতাবস্থায় দেখতে পেতাম। অর্থাৎ তিনি সারা রাত ঘুমাতেনও না; আবার সারা রাত বিনিদ্রও থাকতেন না"।

হযরত ওমর (রাঃ) যা করতেন:

وكان عمر رضي الله عنه يصلي من الليل ما شاء الله حتى إذا كان من أخر الليل أيقظ أهله فيقول الصلاة الصلاة. অর্থাৎ "হযরত ওমর (রাঃ) রাতের অনেকাংশে নামায আদায় করতেন। তাঁর পরিবারবর্গকে জাগ্রত করতেন এবং বলতেন, নামায, নামায"।

(খ) রাতের প্রথমভাগে ঘুমানো। অতঃপর যখন ঘুম শেষ হবে, তখন জাগ্রত হয়ে বাকী রাত এবাদতে কাটানো।

হযরত সুফিয়ান ছওরী (রহঃ) এর আমল:

انها أول نومة . فإذا انتبهت لم أقلها يعنى لم ينم . অর্থাৎ "ঐটাই হচ্ছে প্রথম নিদ্রা। (অর্থাৎ রাতের প্রথমভাগে তিনি ঘুমিয়ে পড়তেন) তারপর যখন আমি জেগে উঠতাম, তখন আর তাকে কম করতাম না"। (অর্থাৎ তিনি আর ঘুমাতেন না)।

ছয়: দু'রাকাত অথবা চার রাকাত পরিমাণ রাত্রি জাগরণ। যেমন হাদীসে এসেছে:

عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال صلوا من الليل، صلوا اربعا، صلوا ركعتين . (شعب الايمان) . অর্থাৎ "নবী করীম (সঃ) বাণী প্রদান করেছেন যে, রাতে নামায আদায় কর, চার রাকাত আদায় কর, দু'রাকাত আদায় কর"। অর্থাৎ দু'রাকা'ত হলেও নামায আদায় কর। এমন যেন না হয় যে, নামাযবিহীন সারা রাত অতিবাহিত হয়ে যায়।

সুনানে আবূ দাউদে বর্ণিত আছে:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استيقظ من الليل وأيقظ إمرأته فصليا جميعا ركعتين كتبا ليلتئذ من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات .

অর্থাৎ রাসূল (সাঃ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি রাতে জেগে উঠল এবং তার স্ত্রীকেও জাগিয়ে তুলল, অত:পর তারা উভয়ে দু'রাকাত নামায আদায় করল, ঐ রাত্রে আল্লাহর বেশী বেশী যিকিরকারী পুরুষ ও মহিলার দপ্তরে তাদের নাম লেখা হবে"।

হযরত ছিরামপুরী (রহঃ)

আমরা হযরত ছিরামপুরী ছাহেব ক্বিবলাহর পরিবার-পরিজন ও তাঁর ছাত্রবৃন্দের কাছ থেকে যতটুকু জানতে পেরেছি তা হল, তিনি শেষ রাতে জাগ্রত হয়ে তেলাওয়াত, সালাত, যিকির, মুরাক্বাবাহ, মুশাহাদা ও দোয়ার মধ্যে সময় অতিবাহিত করতেন। এটা তাঁর

প্রাত্যহিক অভ্যাসে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। তিনি শেষ রাত্রে দোয়ার মধ্যে খুব বেশী কান্নাকাটি করতেন। এতে তাঁর অত্যাধিক খোদাভীতির পরিচয় পাওয়া যায়।

الرياء (লোক দেখানো আমল)

ক্বোরআনে কারীম ও আহাদীছে নববীর মধ্যে رياء এর প্রচন্ড নিন্দা করা হয়েছে:

ক্বোরআন যা বলে:

فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون (سورة الماعون) অর্থাৎ "সেই সকল নামাযীদের জন্য ধ্বংস অনিবার্য, যারা নিজ নামাযের ক্ষেত্রে অমনোযোগী, যারা লোক দেখানো নামায পড়ে এবং নিত্য ব্যবহার্য বস্তু অন্যকে দেয় না"।

فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا (سورة الكهف) অর্থাৎ "যারা আল্লাহকে দেখতে চায়, তারা যেন সৎ কাজ করে এবং আল্লাহর এবাদতে কাউকে শরীক না করে"। প্রকাশ থাকে যে, رياء হচ্ছে ছোট শিরক। আমাদেরকে ধ্বংস করে দেয়ার নিমিত্তে শয়তান মহামারির আকারে আমাদের মধ্যে رياء ঢুকিয়ে দিয়েছে। সুতরাং আমাদেরকে অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করে চলতে হবে।

হাদীস যা বলে:

من عمل عملا فيه غيرى فهو للذى أشرك وانا منه برئ.) "যে ব্যক্তি কোন আমল করল, যাতে আমি ছাড়াও অংশীদার রয়েছে তবে তা ঐ ব্যক্তির জন্য হবে যাকে শরীক করা হয়েছে। এ আমল থেকে আমি মুক্ত")।

অন্য একটি হাদীস:

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان أخوف ما أخاف عليكم الشرك الاصغر. قالوا يا رسول الله وما الشرك الاصغر؟ قال الرياء، يقول الله عز وجل يوم القيامة اذا جزى الناس بأعمالهم اذهبوا الى الذين كنتم تراؤون فى الدنيا. هل تجدون عندهم خيرا.

অর্থাৎ "রাসূলে কারীম (সঃ) বলেছেন, তোমাদের উপর আমি যে বিষয়টির সর্বাধিক ভয় করছি তা হলো ছোট শিরক। উপস্থিত সাহাবা জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! ছোট শিরক কী? তিনি বললেন, এটা হচ্ছে 'রিয়া' তথা লোক দেখানো আমল। আল্লাহ তায়ালা কিয়ামতের দিন যখন লোকজনকে তাদের আমলের প্রতিদান দান করবেন, তখন রিয়াকার সম্প্রদায়কে বলবেন, তোমরা ঐ সকল লোকদের কাছে যাও যাদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য তোমরা পৃথিবীতে আমল করেছ। দেখো, তাদের কাছে কোন প্রতিদান পাও কি না"।

বিশ্লেষণ:

رياء শব্দটি رؤية থেকে এসেছে। এর অর্থ অন্যকে প্রদর্শন করা। এটার বিভিন্ন দিক রয়েছে। যেমন -

এক: الرياء فى الدين - এটা আবার বিভিন্ন প্রকারের:

(ক) এটা দেহের দিক থেকে হতে পারে। যেমন- রুগ্নতা ও দুর্বলতা প্রদর্শন। এটা দ্বারা অত্যাধিক কষ্ট প্রদর্শন ও পরকালের ভয়ের ক্ষেত্রে আধিক্যের প্রতি ইঙ্গিত উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। এভাবে এলোমেলো চুল প্রদর্শন, যা দ্বারা দ্বীনের দুরাবস্থায় নিজ চিন্তামগ্নতার প্রকাশ উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। ঠিক এমনিভাবে স্বর নামিয়ে কথা বলা অথবা ঠোঁটের মধ্যে শুষ্কভাব

নিয়ে আসা, যা দ্বারা নিরবচ্ছিন্ন রোযা রাখার প্রকাশ উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। হাঁটার সময় মাথা সামন দিকে ঝুঁকিয়ে হাঁটা।

চেহারায় সেজদার চিহ্ন অবশিষ্ট রাখা।

আর এ জন্যই হযরত ঈসা (আঃ) বলেছেন:

إذا صام أحدكم فليدهن رأسه ويرجل شعره ("তোমাদের কেউ যখন রোযা রাখবে, তখন সে যেন তার মাথায় তেল দেয় এবং চুল আঁচড়ায়")। অর্থাৎ রোযা রাখার কোন আলামত যেন প্রকাশ না পায়।

(খ) الرياء من جهة اللباس - পরিধেয় বস্ত্রের দিক থেকে হতে পারে। এটা আবার বিভিন্ন প্রকারের হতে পারে:

(১) মোটা কাপড় পরিধান করা।

(২) ঘন্টার নিচে কাপড় পরিধান করা।

(গ) الرياء بالقول অর্থাৎ কথাবার্তায় রিয়া প্রদর্শন। এটা বিভিন্ন প্রকারের হয়ে থাকে:

(১) ওয়াজ নসীহতে।

(২) যিকির-আযকারে।

(৩) হাদীস মুখস্ত করণে।

(৪) জ্ঞানের আধিক্য প্রদর্শনে।

(৫) লোকজনের সামনে উভয় ঠোঁট প্রবলভাবে নাড়িয়ে যিকির করা।

(৬) লোকজনের সামনে নিষিদ্ধ কার্যাবলির প্রতি ক্রোধ প্রদর্শন।

(ঘ) الرياء بالعمل - আমলের ক্ষেত্রে রিয়া। যেমন-

(১) সুদীর্ঘ ক্বিয়ামের সাথে নামায আদায় করা।

(২) রুকূ-সেজদাহ দীর্ঘ করা।

(৩) অত্যাধিক নম্রতা প্রদর্শন। ইত্যাদি ....

হযরত ছিরামপুরী (রহঃ):

আমরা যতদূর জানি, হযরত ছাহেব ক্বিবলাহর জীবন ছিল সেন্ট পার্সেন্ট রিয়ামুক্ত জীবন। তিনি একজন উঁচুস্তরের আবিদ, স্বনামধন্য ক্বারী এবং আল্লাহ প্রদত্ত অনেক বিরল বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন। এতদসত্বেও তাঁর কাছ থেকে কখনও রিয়া প্রকাশ পায়নি। উপরন্তু তিনি সর্বদা লোকজনকে এ ব্যাপারে সচেতন থাকার তাগিদ দিতেন।

<u>الحلم</u> <u>(বুদ্ধিমত্তা)</u>

রিয়াদ্বাতুল মুতাআল্লিমীন গ্রন্থে আল্লামা হাফিজ আল ইরাক্বী হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন:

عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم . (رواه الطبرانى)

অর্থাৎ "নবী করীম (সাঃ) বাণী প্রদান করেছেন যে, নিঃসন্দেহে প্রকৃত জ্ঞান, শিক্ষা অর্জনের মাধ্যমে এবং প্রকৃত ধৈর্য ও স্থিরবুদ্ধিতা অনুশীলনের মাধ্যমে লভিত হয়"।

উক্ত গ্রন্থে আরেকটি হাদীসের উল্লেখ রয়েছে, যেখানে রাসূল (সঃ) বলেছেন:

أطلبوا العلم واطلبوا مع العلم السكينة والحلم . لينوا لمن تعلمون ولمن تعلمون منه .

ولا تكونوا من جبابرة العلماء فيغلب جهلكم عليكم .
অর্থাৎ "জ্ঞান অন্বেষণ কর এবং জ্ঞান অর্জনের সাথে সাথে ধৈর্য ও বুদ্ধিমত্তাও অন্বেষণ কর। আর শিক্ষার্থীদের সাথে কোমল আচরণ কর। অনুরূপভাবে শিক্ষকদের সাথেও। আর তোমরা কঠিন হৃদয়ধারী আলেমদের অন্তর্ভুক্ত হয়োনা। তাহলে তোমাদের অজ্ঞতা অবশ্যই তোমাদের উপর জয়ী হয়ে যাবে"।

একবার নবী করীম (সঃ) আশাজ্ব বিন কায়েছকে বলেছিলেন:
إن فيك خلقين يحبهما الله : الحلم والاناة ("নিশ্চয়ই তোমার মধ্যে দু'টি গুণ রয়েছে, যা আল্লাহ ও তদীয় রাসূল (সাঃ) ভালবাসেন, তা হচ্ছে বুদ্ধিমত্তা ও স্থিরতা")।

<u>কয়েকটি ঘটনা:</u>

(ক) একবার এক লোক হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) কে গালিগালাজ করল। যখন সে ক্ষান্ত হল, তখন হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বললেন:
يا عكرمة! أنظر هل للرجل حاجة فنقضيها ("হে ইকরামা! দেখতো ঐ লোকটির আর কোন প্রয়োজন আছে কি, যা আমরা পূর্ণ করে দিতে পারি? এ কথা শুনে লোকটি মাথা নিচু করে ফেলল এবং তার কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত হল")। (মিনহাজুল ক্বাছিদীন)

(খ) একবার জনৈক ব্যক্তি মুয়াবিয়া (রাঃ) কে অত্যন্ত কঠিন কথা শুনাল। তখন তাকে বলা হল, আপনি কি তাকে শাস্তি দেবেন? জবাবে তিনি বললেন:
إني لأستحيي أن يضيق حلمي عن ذنب أحد من رعيتي. ("আমি লজ্জা বোধ করছি এ জন্য যে, আমার প্রজাদের কারো অপরাধ থেকে আমার প্রজ্ঞা সংকোচিত হয়ে যাক")।

(গ) একবার হযরত আবু যার গিফারী (রাঃ) এর গোলাম এসে বলল যে, আপনার বকরীর পা ভেঙ্গে গিয়েছে। তিনি বললেন, কে ভেঙ্গেছে? বলল, আমিই ইচ্ছাকৃতভাবে ভেঙ্গেছি। বললেন, কেন? বলল, যাতে আপনি রাগান্বিত হয়ে আমাকে প্রহার করেন এবং পাপী হয়ে যান। তখন তিনি বললেন, لأغيظن من حرصك على غيظي অর্থাৎ "আমি অবশ্যই তোমার মন্দ কাজের দিকে ভ্রুক্ষেপ না করে আমার ক্রোধের উপরই অধিক ক্রোধান্বিত হব। এই বলে তিনি তাকে আযাদ করে দিলেন।

(ঘ) একবার জনৈক ব্যক্তি হযরত আদী ইবনে হাতেমকে খুব গালিগালাজ করল। তিনি তখন নিশ্চুপ ছিলেন। অতঃপর সে যখন তার গালিগালাজ বন্ধ করল, তখন তিনি তাকে বললেন, إن كان بقي عندك شيئ فقل قبل أن يأتي شباب الحي فإنهم إن يسمعوك تقول هذا لسيدهم لم يرضو. অর্থাৎ "তোমার যদি আরও কিছু বলার অবশিষ্ট থাকে, তবে গোত্রের যুবকদের আসার আগেই তা বলে ফেল। কেননা যদি তারা শুনে যে, তুমি তাদের নেতাকে এ সব কথা বলছ, তবে তারা ক্ষেপে যাবে"। এতে তোমার বিপদ হবে।

(ঙ) একবার হযরত ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহঃ) রাতের আধারে মসজিদে প্রবেশ করলেন। অতঃপর তিনি এক ঘুমন্ত ব্যক্তিকে অতিক্রম করতে গিয়ে হোচট খেলেন। তখন লোকটি অন্ধকারে মাথা তুলে বলল, কিহে, পাগল নাকি? তিনি বললেন: না পাগল নই। এমতাবস্থায় প্রহরী এসে লোকটিকে পাকড়াও করল। তিনি বললেন, ওকে ছেড়ে দাও। ও শুধু আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল, আমি পাগল কি না? আমিও জবাবে বলেছি, না আমি পাগল নই।

হযরত ছিরামপুরী সাহেবের حلم :

হযরত ছিরামপুরী সাহেবের জীবনে حلم তথা বুদ্ধিমত্তার যথেষ্ট কাহিনী বিদ্যমান। তম্মধ্যে একটি কাহিনী সম্মানিত পাঠকবৃন্দের কাছে তুলে ধরার প্রয়াস রাখি:

ছিরামপুরী সাহেবের তৃতীয় ছেলে জনাব হাফিজ মোঃ ফখরুল হুদা সাহেব, যিনি এখন কাতারের প্রথম সারির ইমাম ও খত্বীব হিসেবে চাকুরীরত আছেন। তাঁকে ছোট বেলায় ক্বোরআন শরীফ হিফজ করার জন্য একটি হাফিজী মাদ্রাসায় ভর্তি করে দিলেন। কিন্তু এক পর্যায়ে যখন দেখলেন যে, পড়াশোনায় তাঁর কোন মনোযোগ নেই, বরং ক্ষেতের ধারে বসে বসে কৃষকদের লাঙল চালানো দর্শন আর একটিবারের জন্য হলেও লাঙ্গল চালানো প্রশিক্ষণ নিতেই বেশী আগ্রহী, তখন তিনি হাট থেকে একজোড়া বলদ কিনে এনে তাঁকে দিয়ে বললেন, বৎস! নাও, এবার শুরু কর। যাক কৃষি কাজ শুরু হয়ে গেল। তিনিও মহানন্দে শুরু করে দিলেন। সারাদিন সূর্যের প্রখর রোদে লাঙল চালাতে চালাতে আর গরু হাঁকাতে হাঁকাতে পরিশেষে বুঝলেন যে, এটা তো পড়াশোনা থেকে আরও কঠিনতম কাজ। এবার থেকে পড়াশোনায়ই মন দেব। ছিরামপুরী সাহেব এ সংবাদ শ্রবণের সাথে সাথে তাঁর এক ভাগ্নে হাফিজ এখলাছুর রহমানকে বাড়িতে ডেকে এনে তাঁর সাথে তাঁকে দিয়ে দিলেন। তিনি মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা শুরু করে দিলেন এবং এক বৎসরে ২২ পারা হিফজ করে ফেললেন এবং দওরার তোয়াক্কা না করে ঐ বৎসরই ঐ ২২ পারা দিয়ে তারাবীহের নামায পড়ালেন। তারপর আরও কিছুদিনে বাকী ৮ পারা হিফজ করে সনদ ও পাগড়ী লাভ করে ফিরে আসলেন। এখানেই হযরত ছিরামপুরী (রহঃ) এর বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, মনোযোগ না দিলে পড়াশোনা হবে না। আর মারধর করে কারোর মধ্যে মনোযোগ সৃষ্টি করা যায় না। সুতরাং হালচাষের দিকে যখন মনোযোগ দেখা যাচ্ছে, তখন হালচাষ করে সে নিজ থেকেই বুঝুক, কোনটি সহজ ও লাভজনক? হযরতের আন্দাজ বিফলে যায়নি। কিছুদিন কাজ করার পর তিনি সত্যিই নিজ থেকে বুঝতে সক্ষম হয়েছিলেন যে, জীবনের স্বাদ ও কল্যাণ তাঁর ঐ লাঙল চালানোর মধ্যে নয়, বরং জীবনের প্রকৃত কল্যাণ পড়াশোনার মধ্যে নিহিত। তাই তিনি একাগ্রতা ও নিষ্ঠার সাথে পড়াশোনা শুরু করেছিলেন বলেই আল্লাহ তায়ালা আজ তাঁর জীবনকে ষোলকলায় পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন।

ذم الدنيا (দুনিয়ার নিন্দা)

কোরআনে করীমে এসেছে:

زين للناس حب الشهوات من النساء و البنين و القناطير المقنطرة من الذهب و الفضة و الخيل المسومة و الانعام و الحرث ذالك متاع الحيوة الدنيا و الله عنده حسن المأب.

অর্থাৎ "পার্থিব জীবনের স্বাচ্ছন্দ্য বড় নয়, বরং আখেরাতের সুখ ভোগই হচ্ছে বড়"।

অন্য আরেক জায়গায় এসেছে:

(آل عمران) وما الحيوة الدنيا الا متاع الغرور অর্থাৎ "পরকালীন জীবনের কথা বিস্মৃত হয়ে পার্থিব জীবনের আরাম-আয়েশের প্রতি মনোনিবেশ করা ধোকা বৈ কিছু নয়"।

অন্যত্র এসেছে:

(سورة يونس) مثل الحيوة الدنيا كماء أنزلناه من السماء ("পার্থিব জীবনের উদাহরণ আকাশ থেকে অবতীর্ণ পানির মত"।

আরেক জায়গায় এসেছে:

اعلموا انما الحيوة الدنيا لعب ولهو وزينة الاية. (سورة الحديد) অর্থাৎ "তোমরা জেনে রেখ যে, এই পার্থিব জীবন নিশ্চিতভাবে খেল-তামাশা ও সৌন্দর্য উপভোগ ছাড়া আর কিছুই নয়"।

সহীহাইনে এসেছে:

হযরত মিসওয়ার ইবনে শাদ্দাদ বর্ণনা করেছেন:

قال رسول الله صلي الله عليه وسلم ما الدنيا في الأخرة الا كمثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بم ذا ترجع অর্থাৎ "পরকালের বদলে দুনিয়া অর্জন তেমন, যেমন তোমাদের কারো সমুদ্রে তার আঙ্গুল রেখে তা দ্বারা অর্জন। সুতরাং সে কী নিয়ে প্রত্যাবর্তন করবে তা তার ভেবে দেখা উচিৎ"।

অন্য একটি হাদীসে এসেছে:

الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر . (مسلم شريف) অর্থাৎ "দুনিয়া মুমিনের কারাগার এবং কাফিরের বেহেশ্‌তস্বরূপ"।

আরেকটি হাদীসে এসেছে:

الدنيا ملعونة ملعون ما فيها الا ما كان لله منها. (ابن ماجه و ترمذى) অর্থাৎ "দুনিয়া এবং এর ভিতরের সব কিছু অভিশপ্ত। তবে ঐ সকল বস্তু নয়, যা একমাত্র আল্লাহর জন্য নিবেদিত"।

অন্য একটি হাদীসে এসেছে:

روى ابو موسى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحب دنياه أضر أخرته ومن أحب أخرته أضر دنياه. فأثروا ما يبقى على ما يفنى.(آخرجه ابن حبان و أحمد والحاكم)

অর্থাৎ নবী করীম (সঃ) বাণী প্রদান করেছেন যে, যে তার দুনিয়াকে ভালবাসল, সে তার আখেরাতের ক্ষতি করল। আর যে তার পরকালকে ভালবাসল, সে তার দুনিয়ার ক্ষতি সাধন করল। সুতরাং তোমরা ধ্বংসশীল বিষয়ের উপর ঐ সকল বিষয়কে প্রাধান্য দাও, যা অবশিষ্ট থাকবে। (অর্থাৎ দুনিয়ার উপর আখেরাতকে প্রাধান্য দাও)

একটি চিঠি:

হযরত হাসান (রা) একবার হযরত ওমর বিন আব্দুল আযীয (রঃ) এর কাছে দুনিয়াকে নিন্দা করতঃ একটি পত্র প্রেরণ করেন। এতে লেখা ছিল:

أما بعد, فإن الدنيا دار ظعن ليست بدار مقام. وإنما أنزل اليها أدم عقوبة فاحذرها يا أمير المؤمنين. فان الزاد منها تركها. تذل من أعزها وتفقر من جمعها كالسم يأكله من لا يعرفه وهو حتفه. فاحذر هذه الدار الفرارة الخالية الخداعة. سرورها مشوب بالحزن وصفوها مشوب بالكدر .

অর্থাৎ "আল্লাহর প্রশংসা এবং নবী করীম (সঃ) এর উপর দুরূদ পাঠপূর্বক কথা হল যে, নিশ্চয়ই দুনিয়া চির বসবাসের আবাসস্থল নয়। আর নিঃসন্দেহে এখানে হযরত আদম (আঃ) কে শাস্তি স্বরূপ প্রেরণ করা হয়েছিল। সুতরাং হে আমীরুল মুমিনীন! দুনিয়া থেকে সতর্কতা অবলম্বন করুন। কেননা এটা থেকে বিমুখ হওয়াই পরিত্রানের একমাত্র পাথেয়। যে ব্যক্তি দুনিয়াকে সম্মানের চোখে দেখেছে দুনিয়া তাকে অপদস্ত করেছে। আর যে পার্থিব সম্পদ

জমা করেছে তাকে দারিদ্রের কষাঘাতে জর্জরিত করেছে। দুনিয়া বিষের মত, যা ঐ ব্যক্তিই পান করে, যে তার ষড়যন্ত্র সম্পর্কে অজ্ঞ। আর এটাই তার প্রকৃত মরণের কারণ হয়। সুতরাং এই ধোকাপূর্ণ খালি ঘর থেকে সতর্কতা অবলম্বন করুন। এই গৃহের সব আনন্দ, দুঃখ-যাতনার ধোকায় পরিপূর্ণ। আর এর স্বচ্ছতা আবর্জনার ধোকায় পূর্ণ"।

হযরত মালিক বিন দীনার (রহঃ) বলেন:

اتقوا السحارة فانها تسحر قلوب العلماء يعنى الدنيا . অর্থাৎ "যাদুকারীনী থেকে তোমরা বেঁচে থেক। কেননা এটা আলিমদের অন্তরকে যাদুগ্রস্থ করে ফেলে। যাদুকারীনী বলতে দুনিয়াকে বুঝিয়েছেন"।

ইউনুস বিন উবায়েদ (রহঃ) এর উপমা:

أ شبه الدنيا كرجل نائم فرأى فى منامه ما يكرهه وما يحب. فبينما هو كذالك انتبه

অর্থাৎ "আমি দুনিয়াকে উপমাস্বরূপ একজন ঘুমন্ত ব্যক্তির সাথে তুলনা করি, যে ঘুমের ঘোরে পছন্দনীয় ও অপছন্দনীয় অনেক কিছু দেখে। এমতাবস্থায় হঠাৎ সে জেগে উঠে"। (তখন তার দেখা কোন কিছুর অস্তিত্ব খুঁজে পায় না)

হযরত ঈসা (আঃ) এর দুনিয়া দর্শন:

ان عيسى عليه السلام رأى الدنيا فى صورة عجوز هتماء عليها من كل زينة. فقال لها كم تزوجت؟ قالت لا أحصيهم قال فكلهم مات عنك أو كلهم طلقك قالت بل كلهم قتلت. فقال عيسى عليه السلام يؤسا لأزواجك الباقية كيف لا يعتبرون بأزواجك الماضيين كيف تهلكينهم واحدا بعد واحد ولا يكونون منك على حذر .

অর্থাৎ "হযরত ঈসা (আঃ) দুনিয়াকে এক বৃদ্ধার আকৃতিতে দেখলেন, যার সৌন্দর্য্যের প্রতিটি স্তরে ভাটা পড়েছে। জিজ্ঞাসা করলেন, কয়টি বিয়ে করেছিলে? সে উত্তরে বলল, গণনা করে শেষ করতে পারব না। তিনি বললেন, তাদের সবাই কি তোমাকে ছেড়ে মৃত্যুবরণ করেছে না সবাই তোমাকে তালাক দিয়েছে? সে বলল, বরং আমি তাদের সবাইকে হত্যা করেছি। তখন হযরত ঈসা (আ) বললেন, আফসোস তোমার ভাবী স্বামীদের জন্য, কিভাবে তারা তোমার পূর্ব স্বামীদের ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে না? তুমি কিভাবে তাদেরকে একের পর এক ধ্বংস করে চলেছ, অথচ তারা এতটুকু সতর্কতা অবলম্বন করে না"।

হযরত ঈসা (আঃ) এর উক্তি:

হযরত ঈসা (আঃ) বলেন:

الدنيا قنطرة فاعبروها ولا تعمروها. هذا مثل واضح . فإن الحياة الدنيا معبر إلى الأخرة والمهد هو الركن الأول على أول القنطرة واللحد هو الركن الثانى على أخر القنطرة .

অর্থাৎ "দুনিয়া একটি সেতুস্বরূপ। তোমার কাজ তা অতিক্রম করা, তা আবাদ করা নয়। এটা একটি সুস্পষ্ট উদাহরণ। কেননা দুনিয়া আখরাতের রাস্তা। আর দোলনা হচ্ছে এই সেতুর প্রথমাংশের প্রথম স্তম্ভ এবং কবর হচ্ছে সেতুটির শেষাংশের দ্বিতীয় স্তম্ভ"।

পার্থিব জীবন সম্পর্কে হযরত ছিরামপুরী সাহেব ক্বিবলাহর আদর্শ:

হযরত ছিরামপুরী সাহেব (রহঃ) এর দুনিয়ার প্রতি কোন আকর্ষণ ছিল না। আমরা যদি তাঁর অতি সাধারণ জীবন যাপনের বাস্তব নমুনা দেখি, তবে তা দিবালোকের মত

পরিস্ফুটিত হয়ে উঠে। তিনি যখন সিলেট জেলার ফেঞ্চুগঞ্জ উপজেলাধীন ঘিলাছড়া ইউনিয়নের আশিঘর গ্রামে আবাস নির্মাণ করেন, তখন বাড়িতে দু'খানা কুঁড়ে ঘর নির্মাণ করেন। আর তা টাকা পয়সার অভাবের কারণে নয়, বরং তা ছিল তাঁর স্বভাবজাত। তিনি বলতেন, দুনিয়ার জীবন তো কোন স্থায়ী জীবন নয়। কোনভাবে তা কাটিয়ে উঠতে পারলেই হয়। পরকালীন স্থায়ী জীবনে বসবাসের জন্য আচ্ছা করে সুন্দর ও সুদৃঢ় ঘর বাড়ির ব্যবস্থা করাই বুদ্ধিমানের কাজ। এই ক্ষণস্থায়ী জীবনে বসবাসের জন্য সুন্দর সুন্দর প্রাসাদ তৈরী করা বোকামী বৈ কিছু নয়। বেশ কয়েক বৎসর পর তাঁর ছেলেরা দালান ঘর তৈরী করার জন্য আব্দার করলেন। তিনি তাতে সম্মত হলেন না। তিনি বলেছিলেন, ইটের ঘরে বসবাস করলে অন্তর ইটের মত শক্ত হয়ে যাবে। তাঁর ধারণা ছিল, এই মুসাফিরখানায় এমন দালান নির্মাণের কোনই প্রয়োজন নেই। জীবনের কোন নিশ্চয়তা নেই। হঠাৎ একদিন নিজের অজান্তেই এই পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়ে চলে যেতে হবে। তাই দুনিয়ার জীবনে চাকচিক্যের কোন মূল্য নেই। পরবর্তীতে তাঁর ছেলেরা তাঁর অসুস্থতাকালে বিভিন্ন লোকজন দ্বারা তাঁর কাছে সুপারিশ পেশ করেন। তিনি অনুমতি না দিয়ে মৌন থাকেন। এই মৌনতার উপর নির্ভর করে তাঁর সাহেবজাদাগণ পাকা ঘর নির্মাণ করেছিলেন।

التوكل (আল্লাহর উপর ভরসা)

আল্লাহ তায়ালা বলেন, وعلى الله فليتوكل المؤمنون অর্থাৎ "আল্লাহর উপরই মুমিনগণ ভরসা করে"। তিনি আরও বলেন, ومن يتوكل على الله فهو حسبه অর্থাৎ "যে আল্লাহর উপর ভরসা করে আল্লাহ তার জন্য যথেষ্ট হন"।

হাদীসে এসেছে:

ان النبى صلى الله عليه وسلم ذكر أنه يدخل الجنة من أمته سبعون الفا لا حساب عليهم. ثم قال هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون

অর্থাৎ নবী করীম (সাঃ) বর্ণনা করেছেন, "নিশ্চয়ই তাঁর উম্মতের মধ্য থেকে ৭০ হাজার লোক বিনা হিসেবে জান্নাতে প্রবেশ করবে। অতঃপর তিনি বলেন, এরা হলেন ঐ সমস্ত লোক, যারা সেঁক নেয়নি, চুরি করেনি, বিভিন্ন বিষয় দিয়ে শুভ অশুভ লক্ষণ নির্ধারণ করেনি এবং যারা তাদের প্রতিপালকের উপর ভরসা রাখে"।

আরেকটি হাদীসে এসেছে:

عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير الخ .

অর্থাৎ "হযরত ওমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, আমি নবী করীম (সাঃ) কে বলতে শুনেছি যে, যদি তোমরা আল্লাহর উপর সত্যিকার অর্থে ভরসা রাখতে, তবে অবশ্যই তিনি তোমাদেরকে রিযিক দিতেন, যেমনিভাবে তিনি পাখিকূলকে রিযিক দিয়ে থাকেন। তারা সকালে বের হয় খালি পেটে এবং বিকেলে ফিরে আসে ভরা পেটে তৃপ্ত হয়ে"।

নবী করীম (সাঃ) এর একটি দোয়া:

اللهم انى أ سئلك التوفيق من الأعمال وصدق التوكل عليك وحسن الظن بك.

অর্থাৎ"হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে নেক আমলের তাওফীক, তোমার উপর সত্যিকারের ভরসা এবং তোমার প্রতি উত্তম ধারণা প্রার্থনা করছি"।

হযরত ছিরামপুরী (রহঃ) তাঁর জীবনের সার্বিক ক্ষেত্রে আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করতেন। আল্লাহ পাক ক্বোরআন শরীফে ঘোষণা করেছেন যে তিনি তাওয়াক্কুলকারীর জন্য যথেষ্ট। আল্লাহর এই শাশ্বত বাণীর এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হলেন হযরত ছিরামপুরী (রহঃ)। কেননা তিনি সত্যিকারের তাওয়াক্কুল করতেন বলেই সাত সাতটি সিধ কেটেও চোর তাঁর জন-মানবহীন ঘরে ঢুকতে পারেনি। বনের হিংস্র প্রাণী বাঘ তাঁকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েও কি ভেবে উল্টো পথে প্রস্থান করেছে। সুতরাং তাঁর তাওয়াক্কুলের দৃষ্টান্ত আমাদের জীবনেও প্রতিফলিত করতে হবে।

জীবনের শেষ প্রান্তে

হযরত ছিরামপুরী ছাহেব ক্বিবলাহ (রহঃ) জীবনের শেষ লগ্নে এসে প্যারালাইসিস রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। এই রোগে তাঁর দেহের বাম পার্শ্ব সম্পূর্ণ বিকল হয়ে গিয়েছিল। এর আগেও একবার তিনি এই রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। প্রথমবার সেরে উঠলেও দ্বিতীয়বার হয়ত আল্লাহ পাকের এই ইচ্ছা ছিল না। তাঁর ইন্তেকাল পর্যন্ত তিনি এই রোগেই আক্রান্ত ছিলেন। দীর্ঘ দশ বৎসর যাবৎ এই রোগে আক্রান্ত থাকার পরও তিনি ছিলেন অটল ও অবিচল। নিজ অবস্থার উপর কোন ধরনের বিরক্তিবোধ তাঁর কোন একটি কথায় বা আচরণে সামান্যতমও প্রকাশ পায়নি। হয়ত তিনি রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সেই বাণীর শেষাংশটুকু স্মরণে রেখেছিলেন, যেখানে তিনি বলেছিলেন, ألا إن يصـــفاكم অর্থাৎ আল্লাহ পাক তাঁর মহব্বতের লোকদেরকে গোনাহ থেকে পরিচ্ছন্ন করার নিমিত্তে রোগ-ব্যাধি, দুঃখ ও কষ্ট ভোগ করতে দেন।

জীবনের শেষাংশে হযরত ছিরামপুরী ছাহেব ক্বিবলাহ (রহঃ) অধিকাংশ সময় তেলাওয়াত শুনে শুনেই সময় অতিবাহিত করতেন। কখনো বা তাঁকে দেখা যেত গভীর ধ্যানে নিমগ্ন। সব সময় তিনি কিবলামুখী হয়ে থাকতেন। জীবনের শেষভাগে তাঁকে দেখতে আসা অতিথিদের সামনে তিনি নীরবে কাঁদতেন। হয়ত সে কান্না ছিল বেদনার কান্না। অথিতিদের সাথে প্রাণ খুলে কথা না বলতে পারার অসহায়ত্বেরই প্রকাশ। কারণ তাঁর সুস্থকালের সমস্ত জীবনই ছিল অত্যন্ত সাবলীল। হয়ত বা সেই অতীত জীবনের কথা স্মরণ করেই দীল তাঁর গুমরে উঠত কান্নায়। সহ্য তিনি করেছিলেন সাধ্যমত। হয়ত নিজের অজান্তেই অশ্রু গড়িয়ে পড়ত। কিন্তু কথা-বার্তায় সব সময় ছিল আল্লাহ পাকের প্রতি তাঁর সন্তুষ্টির প্রকাশ। আল্লাহ পাকের প্রতি তাঁর ছিল অবিচল আস্থা। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি পরীক্ষা। তাই তিনি জীবনের এই শেষ ভাগেও কখনো ভেঙ্গে পড়েননি। আর তাঁর এই অবিচল মনোভাবের কারণেই এই কঠিন রোগ তাঁর সুঠাম দেহের উপর কোন প্রভাব ফেলতে পারেনি। তাঁকে দেখলে মনেই হত না যে, তিনি এই দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত। তবে ইন্তেক্বালের কয়েকদিন আগে হঠাৎ করেই তিনি কেমন যেন হয়ে গেলেন। আগের মত আর কাউকে তেমন চিনতে পারতেন না। ধীরে ধীরে তাঁর বোধশক্তি লোপ পেয়ে গেল, যার ফলে তাঁর দেহের সুগঠিত বাঁধনও তড়িৎ গতিতে ভেঙ্গে পড়ল। হায়রে জীবন! আল্লাহর ইচ্ছার কী অদ্ভুত বাস্তবায়ন। এত দ্রুত এই পরিবর্তন! তাঁর সুযোগ্য সন্তানগণ আল্লাহর ওয়াস্তে একটি গরু জবেহ করার ইচ্ছা করলেন। গরু ক্রয় করলেন। গরুটি ছিল ভীষণ পাঁজি। দু' তিনজনের পক্ষে গরুটিকে সামাল দেয়া খুবই কঠিন

ছিল। কিন্তু অবাক করা কথা হল, গরুটিকে যখন অনেক কষ্টে ছিরামপুরী ছাহেবের বাড়িতে নিয়ে আসা হল তখন সে একদম নিশ্চুপ হয়ে গেল। শুধু তাই নয়, আপন মনে গরুটি হযরত ছিরামপুরী ছাহেবের শয়নকক্ষে ঢুকে তাঁর পার্শ্বে একদম চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। উপস্থিত লোকজন অবাক হয়ে দেখল অবোধ গরুটির এই বোধ্য কান্ড। হযরত ছিরামপুরী ছাহেবের তখন জাগতিক বোধগম্যতা বলতে কিছু ছিল না। ধীরে ধীরে তাঁর অবস্থা ক্রমেই অবনতির দিকে যেতে লাগল।

পরিশেষে আল্লাহর এই নেক বান্দা ১৯৯৮ খ্রীষ্টাব্দের ১লা অক্টোবর রোজ বুধবার মাওলায়ে কুল কায়েনাতের সান্নিধ্য লাভের উদ্দেশ্যে এ ধরণীর মায়া চিরদিনের জন্য ত্যাগ করে চলে গেলেন। ইন্না... লিল্লাহি ওয়া ইন্না... ইলাইহি রা.. জিউ..ন। ইনতেক্বালের সময় তাঁর বয়স ছিল ৮৩ বছর।

বিদায় বেলায় হযরত ছিরামপুরী (রহঃ)

হযরত ছিরামপুরী (রহঃ) যেদিন ইহসংসার পরিত্যাগ করে চির বিদায় নিয়েছিলেন সেদিনটি ছিল বুধবার। তাঁর পারিবারিক সূত্রে আমরা জানতে পারি যে, এর আগের সোমবার থেকে তাঁর চোখ বন্ধ ছিল। তাঁর ইনতিকালের পূর্ব পর্যন্ত মোট তিনবার তিনি চোখ মেলে তাকিয়েছিলেন। সে বিবরণটি সম্মানিত পাঠকবৃন্দের সম্মুখে তুলে ধরার প্রয়াস রাখি।

মঙ্গলবার মাগরিবের নামাযের সময় তিনি চোখ বন্ধ করে শুয়েছিলেন। মাগরিবের আযান শুনে সবাই নামায আদায় করার জন্য নিজ নিজ কক্ষে ফিরে গিয়েছিলেন। তাঁর আদরের কন্যা সালেহা খাতুন তাঁরই পাশে নামায আদায় করে তাঁর শিয়রের পাশে বসেছিলেন। এমতাবস্থায় তিনি হঠাৎ আবেগাপ্লুত হয়ে পিতাকে ডেকে উঠলেন। আব্বাজান! আজ কয়েকদিন হল আপনি আমাদের কারো দিকে তাকাচ্ছেন না। একমাত্র কন্যা হিসেবে আমাকে তো আপনি অনেক আদর করতেন। দয়া করে একটিবার আমার দিকে তাকান। তিনি তাঁর কন্যার এমন ব্যাকুল কন্ঠের আহবান উপেক্ষা করতে পারলেন না। মাত্র একবার তার দিকে চোখ মেলে তাকিয়েছিলেন। এর কিছুক্ষণ পর অন্যরা নামায আদায় করে ফিরে এসে যখন শুনলেন যে, তিনি চোখ মেলে তাকিয়েছেন, তখন তাঁর নাতি-নাতনীরা বলতে লাগল, দাদাজান! আমাদের দিকে একবার তাকান। তখন তিনি এমন এক আওয়াজ দিয়ে উঠলেন যে, সবাই আতংকিত হয়ে গেলেন। সবাই তখন বুঝতে পেরেছিলেন যে, তিনি খুবই বিরক্ত হয়েছেন। এর আগের সোমবার দিন একবার চোখ মেলে তাকিয়েছিলেন, যখন তাঁর বড় নাতনী রায়হানা খাতুন তাঁকে চোখ মেলে তাকানোর জন্য ফন্দি করে বলেছিল, দাদাজান! ছোট চাচা হাফিজ আবু আব্দুল্লাহ মোঃ আইনুল হুদা আমেরিকা থেকে দেশে ফিরে এসেছেন। তখন তাঁকে এক নজর দেখবেন বলে মাত্র একবার চোখ মেলে তাকিয়েছিলেন। মোটকথা, তাঁর চোখ কোন রোগের কারণে যে বন্ধ হয়েছিল তা মোটেই নয়; বরং তিনি তাঁর পার্থিব জীবনের শেষ সময়টুকু মুরাকাবাহ ও মুশাহাদায় অতিবাহিত করতেই ইচ্ছাকৃতভাবে চোখ বন্ধ করে রেখেছিলেন।

অচেনা সুগন্ধির আবাস:

ইনতিকালের অনেকদিন পূর্ব থেকে হযরত ছিরামপুরী (রহঃ) এর মুখে কিছুটা দুর্গন্ধ ছিল। কারণ তিনি ভাল করে কুলি করতে পারতেন না। কিন্তু তাঁর ইনতিকালের পূর্বের দিন

থেকে বাড়ির সবাই এক ধরনের অচেনা সুগন্ধি পাচ্ছিলেন, যা তাঁর মুখগহবর থেকে বেরুচ্ছিল। আর এই সুগন্ধি তাঁর ইনতিকাল পর্যন্ত স্থায়ী ছিল। হযরত ছিরামপুরী (রহঃ) এর শ্বশুর মহোদয় কৌড়িয়ার মাওলানা আব্বাস আলী সাহেব কিবলার ইনতিকালের মুহুর্তেও ঠিক এমনি সুগন্ধি বেরিয়েছিল।

আল্লাহর যিকিরে নিমগ্নতা:

ইনতিকালের কয়েকদিন পূর্ব থেকে হযরত ছিরামপুরী (রহঃ) এর চোখ বন্ধ থাকলেও সর্বক্ষণ তিনি আল্লাহর যিকিরে মাশগুল ছিলেন। পাশে অবস্থানরত সবাই সব সময় তাঁর জিহবার নড়াচড়া প্রত্যক্ষ করেছিলেন। অনায়াসে বুঝা যেত যে, তিনি যিকরুল্লাহতে মাশগুল আছেন। তাঁর যিকিরে নিমগ্নতার আরেকটি নিদর্শন এই ছিল যে, তাঁর ইনতিকালের সময় সবাই দেখতে পেয়েছিলেন তাঁর বৃদ্ধাঙ্গুলির অগ্রভাগ মধ্যমাঙ্গুলির নিম্নের আঁকের উপর অবস্থান করছে।। সবাই তখন বুঝতে পেরেছিলেন যে, যিকিরের সাথে তাঁর আঙ্গুলও সচল ছিল।

সূরা ইয়াসিনের তেলাওয়াত শ্রবণ ও ইনতিকাল:

ইনতিকালের কয়েক মুহুর্ত পূর্বে তাঁর বড় সাহেবজাদা মাওলানা শামসুল হুদা সাহেব তাঁর বাম পার্শ্বে বসে সূরা ইয়াসীন তেলাওয়াত করছিলেন। এক পর্যায়ে তিনি পিতাকে বললেন, আমি সূরা ইয়াসীন তেলাওয়াত করছি, আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন? তখন তাঁর কথা বলার শক্তি ছিল না। অঙ্গভঙ্গির আলোকে সবাই বুঝতে পারলেন যে, তিনি বুঝাতে চাইছেন যে, তিনি শুনতে পাচ্ছেন। এ সময় তাঁর ডান পার্শ্বে তাঁর মেঝ ছেলে মাওলানা নজমুল হুদা বসা ছিলেন। ঔষধ সেবনের সময় হয়ে যাওয়ায় তাঁর কন্যা ঔষধ নিয়ে আসলেন। ঔষধ সেবনের সুবিধার্থে মেঝ ছেলে তাঁর পবিত্র মাথাটি তার ডান হাতের উপর তুলে আনলেন। তিনি এক চামচ পরিমাণ ঔষধ সেবন করলেন। এদিকে বাম পার্শ্বে বসে তাঁর বড় ছেলে সূরা ইয়াসীন পাঠ করছিলেন। তিনি যখন এই আয়াতখানা পড়ছিলেন- قيل ادخل الجنة। তখন সবার কলেমা পাঠের আওয়াজ শুনে তিনি তাকিয়ে দেখলেন, তাঁর ওয়ালিদ মুহতারাম জিন্দেগীর সব হিসেব-নিকেশ চুকিয়ে ফেলে অতি আদরের ছেলে মেয়েদের শোক সাগরে ভাসিয়ে চলে গেছেন তাঁর মাহবুব আল্লাহর সান্নিধ্যে। ইন্নাল্লিাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন। আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন স্বীয় করুণায় তাঁকে জান্নাতুল ফেরদাউসে স্থান দান করুন।

উল্লেখ্য যে, ইনতিকালের সময় তাঁর পবিত্র মস্তক তাঁর মেঝ ছেলে মাওঃ নজমুল হুদা সাহেবের হাতের উপর তুলে ধরা ছিল।

রেখে যাওয়া সন্তানাদি

হযরত ছিরামপুরী ছাহেব ক্বিবলাহ ইনতেক্বালের সময় চার ছেলে এবং এক মেয়ে রেখে যান। বড় ছেলে হযরত মাওলানা শামছুল হুদা বর্তমানে ইছামতি কামিল মাদ্রাসার স্বনামধন্য মুহাদ্দিছ হিসেবে কর্মরত আছেন। মেঝ ছেলে হযরত মাওলানা নাজমুল হুদা রাখালগঞ্জ ডি. কিউ আলিম মাদ্রাসার আরবী প্রভাষক পদে কর্মরত আছেন। তৃতীয় ছেলে হাফিজ মোহাম্মদ ফখরুল হুদা বর্তমানে কাতারের প্রথম সারির ইমাম ও খতীব হিসেবে কর্মরত আছেন। চতুর্থ

ছেলে হাফিজ মাওলানা আবু আব্দিল্লাহ মুহাম্মদ আইনুল হুদা বর্তমানে আমেরিকার নিউইয়র্কে আর রাহমান জামে মসজিদের ইমাম ও খতীব হিসেবে কর্মরত আছেন। হযরত ছিরামপুরী ছাহেবের একমাত্র মেয়ে ছালেহা খাতুন। হুজুর ক্বিবলাহর একমাত্র জামাতা জনাব আব্দুর রহীম বখশ (ঘিলাছড়া, আশিঘর, বখশবাড়ি) বর্তমানে লন্ডনে অবস্থান করছেন।

হযরত ছিরামপুরী (রহ:) এর খেদমতের জন্য স্বপ্নযোগে রাসুল (সা:) এর নির্দেশ

অসুস্থতাকালে হযরত ছিরামপুরী (রহ:) শয়নকক্ষের একটি বিছানায় একটি পালঙ্কে একা থাকতেন। তাঁর সার্বিক সুবিধার্থে এই ব্যবস্থা করা হয়েছিল। তাঁর স্ত্রী মুহতারামা থাকতেন পার্শ্বের আরেকটি পালঙ্কে । একরাতে এমনি তিনি তাঁর বিছানায় ঘুমিয়েছিলেন। পার্শ্ববর্তী বিছানায় ঘুমিয়ে ছিলেন হযরত ছিরামপুরী (রহ:)। ঘুমের মধ্যে তাঁর স্ত্রী মুহতারামা স্বপ্নে দেখলেন, লম্বা জামা পরিহিত একজন বুযুর্গ ব্যক্তি হযরত ছিরামপুরী (রহ:) এর বিছানার পার্শ্বে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর দেহ থেকে এক ধরনের উজ্জ্বল আলো ছড়াচ্ছিল, আর ঘরখানা সে আলোয় আলোকিত হচ্ছিল। স্বপ্নের মধ্যে এমন কেউ ছিল না যে আগন্তুকের পরিচয় প্রদান করবেন। তদুপরি তাঁর মনের মধ্যে এই ধারণাই প্রবল হয়ে উঠেছিল যে, ইনি আর কেউ নন, ইনিই স্বয়ং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। হযরতের স্ত্রী মুহতারামা স্বপ্নের মধ্যে শুনছিলেন, আগন্তুক হযরতের দিকে মুখ ফিরিয়ে তাঁকে (স্ত্রী মুহতারামা) উদ্দেশ্য করে বলছেন, আপনি বেশী বেশী করে তাঁর খেদমত করবেন। উত্তরে তিনি বলেছিলেন, জ্বি, আমি তাঁর খেদমত করছি। একথা বলতেই তাঁর নিদ্রা ভেঙ্গে গেল।

স্বপনে হযরত ছিরামপুরী (রহ:)

এক: হযরত ছিরামপুরী (রহঃ) এর ইন্তেক্বালের কিছুদিন পর একদিন তাঁর বড় ছাহেবজাদা হযরত মাওলানা শামছুল হুদা ছাহেব ও মেঝ ছাহেবজাদা হযরত মাওলানা নজমুল হুদা ছাহেবের নিকট গ্রামের মাওলানা আং শাকুর এসে বললেন, গতকল্য আমরা সবাই হযরত ছিরামপুরী ছাহেব ক্বিবলাহ (রহঃ) এর ইন্তেক্বাল উপলক্ষে একটি ইছালে ছওয়াব মাহফিল আয়োজনের মনস্থ করেছি এবং এই মাহফিলে হযরতের দীর্ঘ দিনের সাথী হযরত মাওলানা আব্দুর রাহমান বর্ণী ছাহেবকে দাওয়াত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আজ রাতে আমি স্বপ্নে দেখলাম, হযরত ছিরামপুরী ছাহেব (রহঃ) আমাকে বলছেন, ইছালে ছওয়াবের মাহফিল করতে হলে দেরী করোনা। কারণ আমি এখানে বেশী দিন থাকবনা, সফরের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ব।

দুই: হযরত ছিরামপুরী (রহঃ) এর স্ত্রী মুহতারামা একদিন স্বপ্নে দেখলেন, তিনি হযরতের সাথে বাড়ির বাইরে একস্থানে কথা বলছেন। সেখানে তখন কোন লোকজন ছিলনা। হযরতের দেহে তখন খুব সুন্দর ঝলমলে একখানা চাদর ছিল। আলাপকালে হঠাৎ পার্শ্ববর্তী টিলায় একজন লোক দেখতে পেয়ে হযরত ছিরামপুরী ছাহেব (রহ:) স্ত্রীকে ঐ চাদর দিয়ে ঢেকে দিলেন। তারপর ঐ লোক যখন চলে গেল তখন আবার চাদরখানা সরিয়ে নিলেন।

তিন: একবার হযরত ছিরামপুরী (রহ:) এর সর্বকনিষ্ঠা ছাহেবজাদী ছালেহা খাতুন স্বপ্নে দেখলেন তিনি এক কবরের পার্শ্বে নামায আদায় করছেন। নামায আদায়ের পর তিনি

ঐ কবরের পার্শ্বে গিয়ে দাঁড়াতেই চিনতে পারলেন যে, কবরখানা তাঁর ওয়ালিদ মুহতারামের। তিনি কবরের পায়ের দিকে অল্পবিস্তর একটি ফুটো দেখতে পেলেন। সে ফুটোর ভিতর দিয়ে হযরত ছিরামপুরী (রহঃ) এর পা যুগলের একটি দেখা যাচ্ছিল, যা আলোয় ঝলমল করছিল।

এছাড়াও হযরত ছিরামপুরী (রহঃ) এর অনেক মুহিব্বীন তাঁকে স্বপনে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন উত্তম পরিস্থিতিতে দেখেছেন। কখনো বা তাঁকে ওয়াজ মাহফিলে যেতে দেখা গেছে, তখন তাঁর পেছনে পেছনে অনেক লোক দেখা গেছে। আবার কখনো বা তাঁকে পবিত্র ক্বোরআনে কারীমের তেলাওয়াতের মশক্ব দিতে দেখা গেছে। যারাই স্বপনে তাঁর দর্শন লাভ করেছেন, তাঁর আনন্দ মিশ্রিত, স্বর্গীয় সুখে উদভাসিত চেহারা দেখে প্রশান্তিতে ভরে উঠেছে তাদের অশান্ত মন।

চারঃ হযরত ছিরামপুরী (রহ:) এর ইন্তিকালের পরের দিন ভোরে যে টিলায় তাঁকে দাফন করা হয়েছিল ঐ টিলার নিচের বাড়ির একজন লোক এসে তাঁর সাহেবজাদাদেরকে বললেন যে, আপনারা কি গতরাত্রে আপনাদের আব্বাজানের কবরের পাশে মীলাদ মহফিলের অনুষ্ঠান করেছেন? তাঁরা বললেন, না তো। প্রশ্নকারী বললেন, বলেন কি? আমরা তো সারা রাত তথায় অনেক লোকের সম্মিলিত মীলাদ পাঠ শুনেছি। (সুবহানাল্লাহ)

অমর ছিরামপুরী (রহঃ)

অনেক দিন হল, হযরত ছিরামপুরী ছাহেব ক্বিবলাহ এ ধরণীর মায়াজাল ছিন্ন করে সফল এক যুদ্ধজয়ী সিপাহসালারের বেশে মহান বারী তায়ালার সান্নিধ্য লাভে চলে গেছেন। কিন্তু আজ এত বছর পরও লোকজন তাঁকে আগলে রেখেছে তাদের হৃদয়ের হেফাজতখানায়। তাঁর রেখে যাওয়া সন্তানদের দেখে আজও তারা কাছে এসে বসেন। শুনেন ছিরামপুরী ছাহেবের স্মৃতিচারণ। এ যেন বড়ই ব্যাকুল চিত্তে, দীলের গহীন থেকে, আপন থেকে আপনতর, সাজানো গুছানো, লুক্কায়িত সেই ছোট্ট অথচ সুবিশাল কুঠির থেকে ভেসে আসা সুর। এর ভেতর দিয়েই তারা যেন পান প্রশান্তির প্রলেপ। আবার কেউ বা হযরত ছিরামপুরী ছাহেব (রহ:) এর উত্তরসুরীদের দেখে নিজ অশ্রু সংবরণ করতে পারেন না। নিঃশব্দে, নিজের অজান্তে গড়িয়ে পড়ে দু'ফুটা তপ্ত অশ্রু। অশ্রুসিক্ত নয়নে তাঁরা বলে উঠেন- আজ ছাহেব নেই তো কী হয়েছে, আপনারা তো আছেন। আপনাদের দিকে তাকালেই হযরত ছাহেব কিবলাহর প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠে, দীলে অনুভূত হয় ইত্বমেনানের সুকোমল ছোঁয়া। কী জানি, হয়ত হযরত ছাহেব ক্বিবলাহর প্রতি তাদের অপরিসীম ইহতেরাম আর অকৃত্ত্ব ভালবাসার বাস্তব প্রতিফলনই এটা। আল্লাহ পাক তার এই বান্দাকে যে সকল বৈশিষ্ট্য দান করে অমরত্ব লাভে ধন্য করেছেন, সেগুলো যদি আমরা আমাদের জীবনে প্রতিফলিত করতে পারি তবে আমরাও মরে অমর হতে পারি। পাঠকদের সম্মুখে সেই বৈশিষ্টাগুলো তুলে ধরতেই আমার এ ক্ষুদ্র প্রয়াস।

মরহুম ছিরামপুরী (রহ:) তাঁর জীবনের এক উল্লেখযোগ্য অংশ ইমামতের দায়িত্বে কাটিয়েছেন। তিনি অত্যন্ত প্রজ্ঞাবান, নিষ্ঠাবান, নিজ ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন, খোদা ভীরু, সৃষ্টির সেবক ও সর্বজন মানিত একজন ইমাম ছিলেন। তাঁর জনপ্রিয়তা লোক সমাজে ইতিহাস সৃষ্টি করেছিল, যা সর্বজন বিদিত। যখন তাঁকে রাখালগঞ্জ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার জন্য নিয়ে আসা হয় তখন রাখালগঞ্জের পানিগাঁও নিবাসী হাজী আবু তাহির সাহেবের ভাষায়

মানিককোনা ও শেখপুর এলাকায় এক হৃদয় বিদারক দৃশ্যের অবতারণা ঘটে। পর্দার আড়ালে নারীরা আর বাইরে পুরুষরা কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। মনে হচ্ছিল যেন তারা তাদের অতি আপন কোন প্রিয়জনকে হারিয়ে ফেলেছেন। আমরা যারা তাঁকে নিয়ে আসতে গিয়েছিলাম তাদের কান্না দেখে আমাদের কারোর চোখ শুকনো রাখতে পারিনি।

স্মৃতিচারণ

(fact and illustration)

(সুদূর আমেরিকায় অবস্থানরত হযরত ছিরামপুরী (রহঃ) এর ক্ষুদে নাতি-নাতনীরা দাদাজানের স্মৃতিচারণ করেছেন। নিম্নে সেগুলো উল্লেখ করা হল)

স্মৃতিচারকঃ

(হাফিজ আবু ছালেহ মুহাম্মদ উবায়দুল্লাহ আল- মামুন,
হযরত আবু আব্দিল্লাহ মুহাম্মদ আইনুল হুদা ছাহেবের বড় ছেলে।)

Indeed A Great Huzur

My grand father died when I was around 4 years old. His name was Shah Muhammmad Abdur Raqib.He had 10 children. 8 sons and two daughters. Half of them died briefly after they were born leaving him with 5 children- 4 sons and 1 daughter.he was known as a great Alim in Bangladesh. He learned in Saudi Arabia. He was well known in our village and when people used to need duwa they would ask him to make it for them. He was well devted into being a great Muslim and I am sure that he was. He was paralyzed. He used to pray sitting down. There were sometimes when he prayed with his eyes. When I asked someone about how he was paralyzed, they told me that he was sitting down on the porch steps when the sun was sitting. They told me not to sit on the floor outside at that time or I would be paralyzed just like my grandfather. When he was resting, some of my cousins and I used to bother him and run away leaving him schreaming at us. After he died I attended his funeral. His eldest son and my eldest uncle, Maulana Shamsul Huda, led his funeral. Then the village people carried his casket and went to bury him. His grave is located in our village Ashighar, Fenchugonj, Bangladesh on a very high hill next to the great wali Shah Amin. There are about 100 steps to climb to reach his grave. Now, people go to make Ziyarat to his grave. He left his four sons to follow his footsteps and be great Alims. This shows that he was indeed a great Huzur.

Abu Saleh Muhammad Ubaidullah Al- Mamun
7th Grade, PS 125 Q, New york

স্মৃতিচারিকাঃ

(হাফিজা সুমাইয়া হুদা
হাফিজ আইনুল হুদা ছাহেবের একমাত্র কন্যা)

A Great Man and An Expert Quranic Teacher.

When I was only 2 years old granfather died. Before he Died, he used to pray with his eyes and make duwa by telling Allah to help him. Sometimes he prayed sitting down. He was really sick when he died. I miss

him. Everyone does. I wish him to be alive so that I could see him. I only saw him in a picture lying on the bad. I feel sad for grandfather. I do not know how he became paralyzed. He died in 1998, it was the first day of October. I cannot remember anything about him because I never really got to see him except that I knew; he was a great man and an expert Quranic teacher. He was very nice. Everyone is making duwa for him, even myself. I never forget what a great man my grand fathar we . No one will.

Sumaya Huda
5th grade, PS 11Q, Woodside, NY 113

স্মৃতিচারক ঃ

(হুসাইন মুহাম্মদ হুদা,
হাফিজ আতিকুল হুদা সাহেবের তৃতীয় ছেলে।

A Great Man and A Great Huzur

A great man and a great huzur. This is how I feel for my grandfather. I feel sad for him. He died before I was born. He died by a terrible pain. He was paralyzed. He could not pray like everyone else. He had to pray with his eyes. He died in 1998, it was really sad. But I still know how he looked like. He had white beard and white hair. Grandfather was very nice. He was a healthy man. He ate healthy food. But the pain still did not go away. That's how he died. Today, I still make duwa for him. And I think that he is in jannah. I am very proud. Grandfather was a great man and a great huzur. I will never forget him. No one will.

About the story

This is a story about a boy who loves his grandfather so much but never got to see him or meet him. And it's about a wonderful grandfather who is so nice. While you read along this story you will understand how this boy loves his grandfather. This is a wonderful story. You might love it. So read along! And you might understand.

Hussain Muhammad Huda
2nd Grade, PS11Q, Woodside, NY 113

স্মৃতিচারক ঃ

(হাসান মুহাম্মদ হুদা
হযরত মাওলানা আতিকুল হুদা সাহেবের চতুর্থ ছেলে।

He Was The Best

He was the best. I learned a Hadith that says"the best among you is the one who learns the Quran and teaches it to others"

Grandfather was the best because he learned the Quran and taught it to all his children as well as others. Grandfather died in 1998. He died before I was born. I miss him forever. He used to pray with his eyes. He moved his eyes I wish he's alive, that is how I feel for grandfather. I feel sad about grandfather. I will never forget about him. No one will. I know how grandfather look' like; white beard and white hair.

Hasan Muhammad Huda
Ist Grade, PS11Q, Woodside, NY 11377